২৪০

সাক্ষরতা বুলেটিন

জ্যৈষ্ঠ ১৪২১

মে ২০১৪

সাক্ষরতা বুলেটিন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের
বেসরকারি ঐক্য প্রতিষ্ঠান
গণসাক্ষরতা অভিযান
থেকে প্রকাশিত

সংখ্যা ২৪০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ মে ২০১৪

সাক্ষরতা বুলেটিন-এ
প্রকাশিত রচনাসমূহের
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ,
মতামত সম্পূর্ণত
লেখকের,
গণসাক্ষরতা অভিযান
কর্তৃপক্ষের নয়।

সূ চি প ত্র

৩ **জাহানারা হক**
স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব মোজাফ্ফর আহমদ

৫ **ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম**
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

৭ **শফি আহমেদ**
আজি হতে শতবর্ষ আগে

১২ **এ এম রাশিদুজ্জামান খান**
কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও শোভন কর্ম-পরিবেশ

১৬ **শাওয়াল খান**
নারীর কর্মঘণ্টা অর্থনীতির মূলস্রোতে সম্পৃক্ত হবে কবে?

২১ **জিয়াউল হাসান**
বিশ্বের চিরদুর্জয় কবি নজরুল

২৪ **বিশেষ প্রতিবেদন**
গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ (৪-১০ মে) ২০১৪

২৭ **তথ্যকণিকা**

২৯ **সংবাদ**

সৌজন্য:
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

জা হা না রা হ ক

স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব মোজাফ্‌ফর আহমদ

অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ এদেশের একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবক। তিনি তার বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে দেশ ও দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন। গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় সম্পর্ক, ব্যক্তিগতভাবে তিনি এই সংস্থার অনেক কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিলেন। গত ২২ মে ছিল তাঁর দ্বিতীয় মৃত্যু বার্ষিকী। দেশ বরেণ্য এই মহান ব্যক্তির স্মৃতির প্রতি আমরা বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

এক বছর পার হয়ে গেল, চলে গেছেন প্রফেসর মোজাফ্‌ফর আহমদ। মোজাফ্‌ফর নামের মানুষেরা খুব কৃতবিদ্য হয়। যেমন ছিলেন আমাদের Mac স্যার বা প্রফেসর মোজাফ্‌ফর আহমেদ চৌধুরী আর উপমহাদেশের প্রখ্যাত মনীষী কমরেড মোজাফ্‌ফর আহমেদ। প্রত্যেকেই কিংবদন্তীসম নক্ষত্র। তাঁদের চলে যাওয়ায় সমাজের বড় বেশী ক্ষতি হয়ে যায়।

আমাদের মোজাফ্‌ফরকে কোন পরিচয়ে পরিচিত করা যাবে? তিনি কি শুধু শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, পণ্ডিত? না গবেষক, সমাজ পরিবর্তনের কর্মী না সংগঠক? আসল উত্তর খুঁজতে খেই হারাতে হয়। তবে তিনি অনেকের মাঝে এক, একক এবং নিঃসন্দেহে স্মরণীয়। বিশেষত এই সময়ে যখন বাংলাদেশ একটা ক্রান্তিকাল পার করছে।

তাঁকে অনেকেই চিনতেন, তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছে আরও অনেকে। ব্যক্তিগত কারিশমা দ্বারা বহুজনকে গুণমুগ্ধ ভক্তে পরিণত করেছিলেন। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের বিশদ বিবরণসমৃদ্ধ টক শো, মিডিয়া প্রতিবেদনে তাঁর সুকৃতির বিশদ বিবরণ তুলে ধরবেন অনেকেই। আমি কেবলই আমার কিছু টুকরো স্মৃতিকে তুলে ধরতে চাই আমার অতি মূল্যবান অথচ অতি সাধারণ স্মৃতির ঝাঁপি থেকে।

তাঁর সাথে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী হিসাবে যখন আমাদের চারদিকের পরিবেশ এমন বিষাক্ত, জটিল, কুটিল হয়ে ওঠেনি। কোন পলিটিক্যাল সালাম বা বন্ধুত্বের বা আনুকূল্যের আঁচ আমাদের জীবনকে করেনি কলুষিত, বিবর্ণ। সহজ, সরল ছিল আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবন যাপন। পড়াশোনা ক্লাশ কক্ষ, গ্রন্থাগার এগুলোই ছিল আমাদের ধ্যান, জ্ঞান আর গতিবিধির পরিসর। এরই মধ্যে তিনি আমাদের মাঝে একটা ক্ষীণ আত্মীয়তার সূত্র খুঁজে বের করেছিলেন।

আমার এক বর্ষীয়ান চাচাতো বোনের শ্বশুরকুলের নাতি ছিলেন মোজাফ্‌ফর। অর্থাৎ সম্পর্কে আমি নানী আর তিনি আমার নাতি। যদিও আত্মীয়তার এই সূত্র তখন সেই অপরিণত বয়সে তেমন সুখকর ছিল না বরং বিব্রত বোধ করতাম। তবে এই নানী-নাতির খুনসুটিটা জীবনের শেষাবধি অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন তিনি। ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ উচ্চকিত কণ্ঠে ডেকে উঠতেন "এই নানী কেমন আছেন?" তারপর অনাবিল শিশুর হাসি।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুটি কয়েক মেধাবী ছেলেমেয়েদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। তখনকার দিনে সেই ১৯৫৫/৫৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি-নিষেধ ও সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ সহপাঠীদের হৃদতার সুযোগ তেমন ছিল না। তবুও আমাদের দেখা হতো (এখনকার মেডিক্যাল কলেজের) উঁচু উঁচু সিঁড়ি পারাপারে কিংবা শীতকালের হিমশীতল গ্রন্থাগারের করিডোরে বা ক্লাশ কক্ষের সামনে গুড়ের কলসির মতো দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েরা – শিক্ষকের সাথে ঢোকা ও ক্লাশ শেষে বেরিয়ে আসা এরই মাঝে কুশল বিনিময় আর একই গ্রুপের টিউটোরিয়াল এর ফলাফল এর খবরাখবর করতেন একজন সুহৃদ ও শুভাকাংক্ষী হিসাবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় যথারীতি ভাল ফলাফল করলেন–ডাক এলো শিক্ষকতায় যোগদানের জন্য। প্রবেশ করলেন প্রফেসর রেহমান সোবহান, প্রফেসর আনিসুর রহমান ও ড. শেখ মাকসুদ আলীর সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বারে। মানুষ গড়ার কারিগর হিসাবে অর্থনীতি বিভাগে। প্রথমোক্ত জনের সাথে তার সখ্যতা সর্বাধিক। একসাথে শিক্ষকতা করেছেন, গবেষণা করেছেন, বাংলাদেশ প্রথম পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ছিলেন। রেহমান সোবহান তাঁর শ্যালিকা প্রফেসর রওনক জাহানের পাণি গ্রহণ করে আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধা পড়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বছর শিক্ষকতা করার পর তিনি চলে যান শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণে, নোবেল লরিয়েট মিল্টন ফ্রেডম্যান প্রত্যক্ষ সাহচর্যে। সেখানেই রওশন জাহানের সাথে পরিচয় ও পরে পরিণয়। দেশে ফিরে তিনি বিভিন্ন সরকারি ও করপোরেট অফিস প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

একসময় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্প উপদেষ্টা দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময়ে তিনি বিভিন্ন পদে নিজেকে শুধু যোগ্য হিসেবেই প্রমাণ করলেন না একই সঙ্গে অভিজ্ঞানে, প্রজ্ঞায়, সত্য কথনে, প্রতিবাদী উচ্চারণে সকলকে উদ্বুদ্ধ করলেন। এরপর দীর্ঘদিন তিনি আই.বি.এ-র প্রধান ছিলেন, যেটাকে তিনি পরম মমতায় গড়ে তুললেন। সমাজের এমন কোন ক্ষেত্র ছিল না যেখানে তার পদচারণা ছিল না। সকলের জন্য তাঁর দ্বার চিল অবারিত। 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, 'সুজন', 'বুড়িগঙ্গা বাঁচাও' আন্দোলনের তিনি ছিলেন পুরোধা। নিজের সহজগম্যতা, সহজ প্রাপ্যতায় কাউকে বঞ্চিত করেননি কখনও।

প্রফেসর মোজাফ্ফর-এর সাথে তাঁর সুযোগ্য স্ত্রী রওশন জাহানও আমার বিশেষ পরিচিত ও কাছের মানুষ। মনে আছে স্ত্রীকে নিয়ে আমাদের আজিমপুরের বাসায় এসেছেন একাধিকবার। তাঁদের আপ্যায়িত করতে পারলে আমার স্বামীও নিজেকে ধন্য মনে করতেন। যদিও সে সুযোগ আমার বেশি মেলেনি। এই বছর দুই তিন আগে তাঁর নাতির জন্মদিনের পারিবারিক জমায়েতে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। এছাড়া মেয়ে সোহেলার বিয়েতে তো গেছিই।

মাঝে মধ্যে অর্থনীতি সমিতি বা কোন সভায় সাক্ষাৎ হলে বলতেন "আচ্ছা আপনি আগের মতো ডিমের হালুয়া বানান না?" মনে পড়লো কবে কোন কালে অর্থনীতি সমিতির কার্যকারী সভায় চা চক্রে হয়তো বাসা থেকে বানিয়ে নেয়া হালুয়া খেয়ে খুশি হয়েছেন শিশুর মতো। তবে প্রশংসা করলে লজ্জাই পেয়েছি বেশি। অনেকবার ভেবেছি যে অবসর পেলে মোজাফ্ফরকে একটু ডিমের হালুয়া খাওয়াতে হবে। কিন্তু প্রাত্যহিকতার বেড়াজালে আমাদের অনেক সুপ্ত ইচ্ছার মত এটার অপমৃত্যু ঘটেছে।

তাঁর মূল্যায়ন করছেন বহু ছাত্র, গুণমুগ্ধ সুহৃদ। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে একজন আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর মোজাফ্ফর শিক্ষকতায় যুক্ত থেকেও শিক্ষকতায় সীমাবদ্ধ ছিলেন না। অসাধারণ বক্তৃতায় সুশীল ও পরিমিত ভাষার ব্যবহারে, পরিশীলিত বাচনভঙ্গিতে আশ্চর্যময় হয়ে উঠতো তার বক্তব্য, শ্রোতারা হতেন বাকরুদ্ধ। সংগঠক হিসেবেও তিনি ছিলেন অনবদ্য, গবেষক-এর মতই। শেষ কয়েক বছর নিজেকে নিবেদিত করেন এক পরিবেশপ্রেমী, পরিশ্রমী, মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব হিসেবে। তাঁর চলে যাওয়াকে মেনে নেয়া সহজ নয় তাঁর স্ত্রী, আত্মজ, আত্মজাদের পক্ষে ও বাংলাদেশে দিশেহারা দিগভ্রান্ত সুশীল সমাজের পক্ষে। আশা করি তাঁর আদর্শ ও অনুপ্রেরণা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে গুণমুগ্ধদের পথ দেখাবে। তাঁর সুকৃতির জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন–তবেই কিছুটা হলেও ঋণমুক্ত হবো তাঁর কাছে।

জাহানারা হক
অধ্যাপক, প্রাক্তন অধ্যক্ষ
ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা

বিজ্ঞপ্তি

আমাদের মাসিক প্রকাশনা *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এর গ্রাহক হওয়ার জন্য অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘদিন থেকে অনেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চেয়ে আমাদেরকে চিঠি দিচ্ছেন। *সাক্ষরতা বুলেটিন* পেতে হলে পাঠকদের কী করণীয় তা আমরা আগেও বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছি। তাদের সুবিধার্থে আবারও জানাচ্ছি, এতদিন *সাক্ষরতা বুলেটিন* বিনামূল্যে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু উচ্চ ডাক মাশুলের কারণে আমাদের পক্ষে আর সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বুলেটিন পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। আগ্রহী পাঠকদের বুলেটিনের গ্রাহক হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ভবিষ্যতেও *সাক্ষরতা বুলেটিন* বিনামূল্যে পাঠানো অব্যাহত থাকবে। তবে গ্রাহকদেরকে ডাক মাশুল বাবদ বছরে ১০০ টাকা এবং ছয় মাসের জন্য ৫০ টাকা দিতে হবে। এই টাকা সরাসরি অথবা মানি অর্ডারযোগে সম্পাদক, সাক্ষরতা বুলেটিন, গণসাক্ষরতা অভিযান, ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুইজনেই বিশ্বমানবতা এবং বিশ্বশান্তির জন্য নিবেদিতপ্রাণ মহাপুরুষ। গভীর দেশপ্রেমিক এই দুই মহাপুরুষের চিন্তাভাবনা ও কর্মকাণ্ডে বাংলা ভাষা এবং বাঙালির প্রতি ছিল অপরিসীম প্রেম। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন,"একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।" এক বিশাল পরিপূর্ণ হৃদয় দিয়ে তিনি মানব কল্যাণের প্রতি গভীর মমত্ব তার জীবনবোধের মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট করে তুলেছেন।

বিশ্বকবির ক্ষেত্রেও তাই। দুজনেই বাংলা এবং বাঙালিকে বিশ্বের দরবারে সুমহান মর্যাদায় হাজির করেছেন, একজন সাহিত্য দিয়ে, অন্যজন রাজনীতি দিয়ে। 'বাঙালি' বলে যে জাতির কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, বঙ্গবন্ধু সেই জাতিকেই আবিষ্কার করেন 'সোনার বাংলায়'। যে বাংলাকে ভালোবেসে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি,' বঙ্গবন্ধু দেশকে ভালোবেসে ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে সেটিকেই জাতীয় সংগীতে রূপ দিলেন। বাঙালির স্বাধীনতা ও মুক্তিসংগ্রামের অগ্রসেনানী জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর জীবনে কবিগুরুর প্রভাব ছিল অপরিসীম।

এক অর্থে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের সুখ দুঃখের সাথী রবীন্দ্রনাথ। যতবার জেলে গেছেন ততবারই বঙ্গবন্ধুর সাথে থাকত *সঞ্চয়িতা*। বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বলেছেন, "প্রতিবারই জেলে যাবার সময় বঙ্গবন্ধু *সঞ্চয়িতা*-টা হাতে তুলে নিতেন। কারাগারের নিঃসঙ্গতায় বঙ্গবন্ধুর জীবনের একমাত্র সঙ্গী ছিল সঞ্চয়িতা। বইটির গায়ে পড়েছিল কারাগারের সেন্সরের অনেকগুলো সিল। অনেক যত্নে রাখা সত্ত্বেও *সঞ্চয়িতা*-র কপিটা বহু ব্যবহারে পুরাতন হয়ে গিয়েছিল।" বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত জীবনেও রবীন্দ্রনাথ যে কতদূর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না।

বেগম মুজিবের মতে, "কবিগুরুর আসন বঙ্গবন্ধুর অন্তরের অন্তঃস্থলে। রাজনৈতিক জীবনের উত্থান-পতন দুঃখ-দৈন্য সর্ব মুহূর্তে তাঁকে দেখতাম বিশ্বকবির বাণী আবৃত্তি করতে। 'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়', অথবা 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে,' প্রভৃতি অসংখ্য গানের টুকরো তিনি আবৃত্তি করে যেতেন দুঃখ-দৈন্য-হতাশায় ভরা অতীতের সেই দিনগুলোতে"।

বঙ্গবন্ধুর রবীন্দ্র-প্রীতির কথা বলতে গিয়ে ১৯৭২ সালে বেগম মুজিব দৈনিক বাংলার সাংবাদিককে অত্যন্ত আবেগময় ভাষায় বলেন, "কোন কারণে আমি মনোক্ষুণ্ন হলে অতীতে বঙ্গবন্ধু আমাকে কবিগুরুর কবিতা শোনাবার প্রতিশ্রুতি দিতেন। আজও শত কাজের চাপে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও এতটুকু সময় পেলেই সন্তানদের নিয়ে তিনি কাব্য আলোচনা করেন,- আবৃত্তি শোনান

পরিবারের লোকদের। রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর সময় একবার একজন বিশ্বস্ত লোককে দিয়ে আমি রবীন্দ্র রচনাবলীর পুরো এক সেট কলকাতা থেকে আনিয়েছিলাম। ওর সামনে যখন উপহার হিসাবে বইগুলো উপস্থিত করলাম খুশির আবেগে তিনি তখন বিহ্বল হয়ে পড়লেন। উজ্জ্বল চোখ দুটো তুলে একবার শুধু তাকালেন। সে চোখে ছিল শিশুর মত তৃপ্তি আর প্রগাঢ় কৃতজ্ঞতা"।

বঙ্গবন্ধুর জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এতটাই বেশি ছিল যে তিনি কথায় কথায়, বক্তৃতায় উপমা দিতেন কবিগুরুর রচনাবলী থেকে। এ রকম অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখে রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর আহবানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নূতন মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেন। প্রধানমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণের কিছুক্ষণ পরেই জনৈক সাংবাদিক যখন বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞেস করেন, 'স্যার, আজকের দিনে জাতির প্রতি আপনার বাণী কি?' জবাবে চিরাচরিত হাস্যমুখে তিনি বলেন:

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রতিবেশী দেশ ভারত সুদৃঢ়, সাহসিক ও প্রত্যক্ষ সমর্থন যুগিয়েছে। শরণার্থীদের আশ্রয়দান, প্রবাসী সরকার গঠনে সহায়তা এবং মুক্তিবাহিনীর সংগঠন, সামরিক প্রশিক্ষণ ও সমরাস্ত্র দিয়ে ভারতের ভূমিকা ছিল প্রত্যক্ষ। আমাদের সেই দুর্দিনের সাথী ও আশ্রয়দাতা ভারতের মহান জনগণ ও সরকারের আমন্ত্রণে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি কোলকাতা সফরে যান। কোলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ভারতের ইতিহাসের বৃহত্তম জনসভায় বঙ্গবন্ধু ভারতবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল কবিগুরুর ভাষায়। সেদিন তিনি যে কবিতার উদ্ধৃতাংশ ব্যবহার করেছিলেন:

নিঃস্ব আমি রিক্ত আমি
দেবার কিছু নাই,
আছে শুধু ভালবাসা
দিলাম আমি তাই।

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করেন। সেদিন পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে রেসকোর্সের ময়দানে লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে দাঁড়িয়ে কবিগুরুর সেই বিখ্যাত কবিতার লাইন "সাত কোটি বাঙালীকে হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করনি" বিপরীতে অশ্রুভেজা কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'কবি গুরু তোমার উক্তি ভুল প্রমাণিত হয়েছে। দেখে যাও, তোমার বাঙালী আজ মানুষ হয়েছে'। রবীন্দ্র গবেষকরা মনে করেন এর থেকে বড় শ্রদ্ধার্ঘ্য কবিগুরুর প্রতি মুক্তিযুদ্ধের মহানায়কের আর কি হতে পারে?

আমাদের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার রবীন্দ্রনাথ পাঠের হাতেখড়ি হয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকেই। অবশ্য পরবর্তী কালে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তিনি বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী হবার সুবাদে রবীন্দ্রনাথকে এবং তাঁর সাহিত্যকে জানার আরো বেশি সুযোগ পেয়েছেন। সুন্দরকে বিকশিত করতে প্রতিটি সংকট ও দুঃসময়ে রবীন্দ্রনাথের গান আর কবিতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকেও অনুপ্রাণিত করেছে। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় নির্জন কারাবাসের দিনগুলোতেও রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "... সব সময়ের মত ফজরের নামাজ পড়ে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর দিন শুরু করতাম। দিন কাটত বই পড়ে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করে আমি মানসিকভাবে উজ্জীবিত হতাম। এর আগেও যতবার আমাকে বন্দী করা হয়েছে, আমি একইভাবে মনোবল সমুন্নত রেখেছি"।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মত আমরাও আশা করি "বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি যতদিন থাকবে, ততদিন রবীন্দ্রনাথ আমাদের আলোর দিশারী হয়ে থাকবেন। তাঁর সৃষ্টি, তাঁর স্বপ্ন আর জীবনদর্শন আগামী প্রজন্মকেও পথ দেখাবে সত্য ও সুন্দরের পক্ষে থাকতে"।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানবতাবাদী-গণতান্ত্রিক চিন্তাদর্শন আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে রবীন্দ্রচর্চায় আমাদের আরো জোর দেয়া উচিত। রবীন্দ্রচর্চা বলা হচ্ছে এ কারণে যে, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা দর্শনে বিশ্ববিদ্যালয়ে কী কী প্রকার বিদ্যা অধীত হবে সেটা স্পষ্ট করে বলা আছে। এর উপর ভিত্তি করে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে বিশ্বভারতী (শান্তিনিকেতন) এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং আর কালক্ষেপন না করে শাহজাদপুরের প্রিয় কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার মধ্য দিয়ে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে একটি সমৃদ্ধ, আধুনিক, অসাম্প্রদায়িক ধারার উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, শাহজাদপুরের রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় যাতে সত্যিকার অর্থে আধুনিক ও একটি আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। তবেই রবীন্দ্রনাথ, বঙ্গবন্ধু ও বাঙালির চেতনার বা আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।

প্রফেসর ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম
সভাপতি, ইতিহাস বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

শ ফি আ হ মে দ

আজি হতে শতবর্ষ আগে

১৯৬৪ সাল। সারা দুনিয়া জুড়ে শেক্সপীয়রের চতুর্থ শততম জন্মবার্ষিকীর চোখ ধাঁধানো নানা বৈচিত্র্যময় আয়োজন। শত সহস্র বই প্রকাশিত হল। বাণিজ্যিক প্রক্রিয়ার পথ ধরে নানা পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন বাজার ছেয়ে ফেললো। যেমনটি আমরা দ্বিতীয় সহস্রাব্দের পূর্তিতে দেখেছি, ওটাকেই একটু পরিমার্জিত করে বুঝে নেয়া যায়। সব পণ্যের গায়ে শেক্সপীয়রের নানা মাপের ছবি। একটা ব্যাপারই শুধু একমাত্রিক। ওই মহান নাট্যকারের একটা ছবিই শুধু প্রামাণিকভাবে প্রাপ্তব্য। অতএব নানা ভঙ্গির বা নানা বয়সের ছবি পাওয়া যায়নি। (আমাদের দেশে রোকেয়া শাখাওয়াৎ হোসেনকে নিয়ে আমাদের যেমন সমস্যা তেমনটাই আর কি!) যাই হোক, ওই ১৯৬৪ সালে অগণিত প্রকাশনার মধ্যে একটি গ্রন্থ প্রবল দৃষ্টি কাড়লো তাবৎ সাহিত্যরসিকদের, শেক্সপিয়রবিদদের, তাত্ত্বিকদের, মাস্টারমশাইদের। বইটি লিখেছেন এমন এক ব্যক্তি যাকে ভূগোলের দিক থেকে আটলান্টিকের ওপর-এপার, মানে ইংল্যণ্ড-আমেরিকার বৃত্তে ফেলা যাবে না। পোলান্ডের মানুষ আয়ান কট (Jan Kott), যিনি আবার যৌবনে হিটলারের নাৎসি বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে লড়াই করেছেন। পরবর্তীকালে অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। ওই আয়ান কট ১৯৬৪ সালে পোলিশ ভাষায় (Szkice O Szekspirze) একটি নাতিকলেবর বই লিখলেন, ইংরেজি প্রতিশব্দে যার শীর্ষ নাম (Shakespeare Our Contemporary), "শেক্সপীয়র আমাদের সমসাময়িক"।

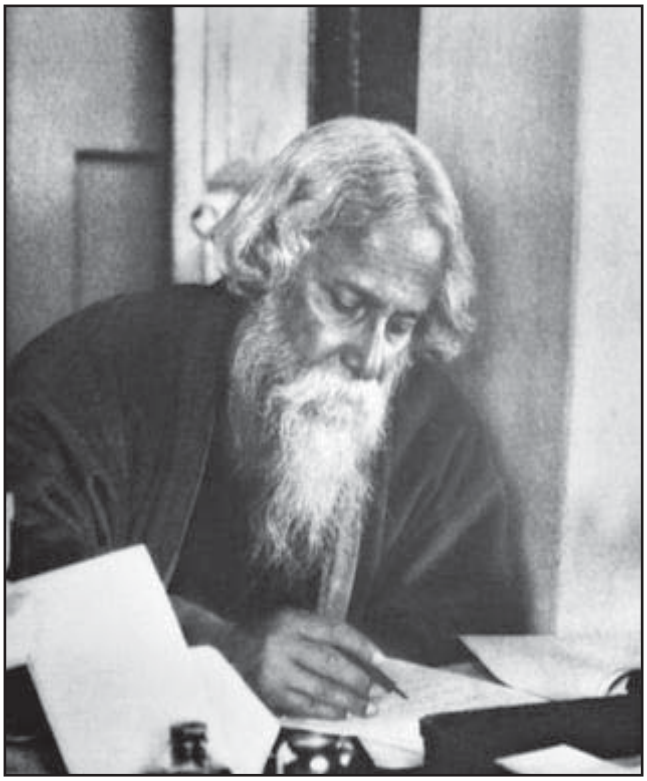

ইংরেজি ভাষায় এই গ্রন্থের খুবই সুখপাঠ্য অনুবাদ করেছেন Boleslaw Tabroski; তাঁর ভাষান্তরের মাধ্যমেই আয়ান কটের শেক্সপীয়র পাঠ স্বচ্ছ ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে। এই বইয়ের দুই প্রচ্ছদের মধ্যে যা আছে, তা পড়ে অনেকেরই চোখ ছানাবড়া হয়েছিল। শেক্সপীয়রকে এমনভাবে বিশ্লেষণ বা পাঠ করা যায়, তাঁর নাট্যসম্ভারের এমন সুতীক্ষ্ম ও তাত্ত্বিক রাজনৈতিক ব্যাখ্যা, সে এক বিস্ময় আমাদের মত পাঠকদের জন্যে, বামপন্থার দিকে যাদের ঝোঁকটা কিছুতেই শেষ হয় না। আমার বিচারে অদ্যাবধি এ অনন্য শেক্সপীয়র-পাঠ, অতুলন, আক্ষরিক অর্থেই।

নানা কাজের মাঝে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কিছু লেখার জন্য সনিষ্ঠ মনোযোগ এবং সময় যখন নেই, যখন বই-পত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করার প্রত্যাশিত অবকাশ খুবই দূরবর্তী, তখন জীবনের নানা অভিজ্ঞতার (যার সিংহভাগই নেতিবাচক) পরিপ্রেক্ষিতে প্রায়শই রবীন্দ্রভাষ্য উঁকি দেয় মনের ভেতর; তাক থেকে রবীন্দ্ররচনা বার করে পাঠ মিলিয়ে নেবার দরকার পড়ে না; তিনি এমনই চিরসখা, চিরবান্ধব, চিরপথপ্রদর্শক যে, এই সমকালের নানান প্রবণতা ও প্রকরণ বুঝতে ও বিবিধ সমস্যার জট খোলার কর্মপ্রয়াসে রবীন্দ্রনাথ যেন অবধারিতভাবে এসে দাঁড়ান আমার আঁখির আগে। তাই আয়ান কট মহাশয়কে অনুকরণ করে হ্রস্ব মাপের একটা রচনা দাঁড় করাতে গিয়ে বার বার স্বাভাবিক কারণেই সামনে চলে আসে সমকাল, তার নানামুখী বৈশিষ্ট্য নিয়ে। সমাজ তো আর থেমে থাকে না, বিধ্বংসী যুদ্ধকালেও তার চলমানতা বিরতিহীন থাকে, হয়তবা তখন আবহটা বেশ অস্বাভাবিক। এই যে সমকালে আমাদের অধিবাস, যেখানে আমরা দেশের-সমাজের এমন একটা প্রপঞ্চ নির্মাণে গলদধর্ম যে, উন্নয়নের পথরেখায় আমরা সদা অগ্রসরমান, আকাশস্পর্শকাতর বাড়ির ছায়ায় ঢাকা পড়ে যায় লক্ষ মানুষের

টঙঘরের বসতি, ঢাকায় প্রতি সন্ধ্যায় ভূরি ভূরি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের তাল-লয়, সেই তখনও কি আমাদের সমাজটা ভালো আছে?

বিবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কালে গরিব-দুঃখী মানুষদের অতিশয় করুণ অবস্থা দেখে সমাজের অন্য সকলের মনেও স্বাভাবিকভাবে দুঃখের জন্ম হয়। তাদের সবারই হয়ত সহায়তার উদার হস্ত নিয়ে এগিয়ে আসার ক্ষমতা নাই। আবার অনেকে আছেন যারা সর্বসাধারণণের এই বিপন্ন অবস্থায় সাহায্য করে কিছু আর্ত মানুষের ইহলৌকিক জীবনে কিছুটা স্বস্তি এনে দিতে আগ্রহী; কিন্তু একই সঙ্গে এমন দানকে তারা তাদের অজ্ঞাত পারলৌকিক জীবনের জন্য বিনিয়োগ বলেও মনে করেন। ত্রাণ দানের ক্ষণটাকে অনেক সময়ই এগিয়ে বা পিছিয়ে নেয়া হয়, এমন একটা সময়-সংস্থানের প্রধান কারণ, টেলিভিশনের চিত্রসাংবাদিকদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ। চিত্রগ্রাহকের ক্যামেরায় সেই চিত্র এমনভাবে ধরা পড়ে যে, তার থেকে এটা বোঝা কষ্টকর হয়ে ওঠে যে, এই লোকহিতকরী উদ্যোগে মুখ্য বিষয়টা কি,–দুর্যোগপীড়িত মানুষদের কষ্টভার লাঘব নাকি ত্রাণদাতা বা আয়োজকদের আত্মপ্রচার।

আজ থেকে ঠিক একশ' বছর আগে সবুজপত্র পত্রিকায় (ভাদ্র, ১৩২১) রবীন্দ্রনাথ ছোট একটি রচনা লিখেছিলেন, শিরোনাম–'লোকহিত'। ওই প্রায় এক শতাব্দী আগে, যখন বাঙালি মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত ক্রমে ক্রমে সংহত হয়ে উঠছে, শক্তি সঞ্চয় করছে এবং তার বিপরীতে অদৃশ্যভাবেই সমাজমানসে অর্জিত-অনার্জিত আভিজাত্যের একটা বিভক্তিরেখা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেই তখনই তিনি বাঙালি চরিত্রের এমন সব প্রবণতাকে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। বস্তুত, সমাজে এর অস্তিত্ব আগে থেকেই ছিল, কিন্তু উচ্চমার্গীয় গোষ্ঠীচেতনার একটা স্বার্থবাদী প্রকাশ তখন এতটা স্থূলভাবে দৃশ্যমান ছিল না। এ ধরনের কালচিহ্নকে আলাদা করে আবিষ্কার করার একটা সময় এসেছিল, বোধহয় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের ব্রিটিশ উদ্যোগ ও বাঙালির আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। তা নিয়ে একটু পরে সংক্ষেপে অবতারণা করা যাবে।

যাই হোক, ১৯১৪ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ওই সময় নাগাদ অনুভব করা যাচ্ছে যে, বাঙালি সমাজে কার্যত এবং তাত্ত্বিকভাবে একটা বিভক্তিসূচক জনভূগোল সৃষ্টি হয়েছে। "লোকসাধারণ বলিয়া একটি পদার্থ আমাদের দেশে আছে"। এবং সেজন্যই এমন প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি হয়েছে যে, 'এই লোকসাধারণের জন্য কিছু করা উচিত' (একটি করে ঊর্ধ্বকমার মধ্যে এই বাক্যের শেষাংশকে যেভাবে আবদ্ধ করা আছে, তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ-কৃত)। এমন করে বিষয়টিকে চিহ্নিত করার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার ধারটা সহজেই অনুভব করা যায় এবং তিনি ওই বাক্যেই আবার বলছেন, এই যে জনসাধারণ, যারা দৃশ্যত অপাংক্তেয় হিসেবে, 'যারে, তুমি ফেলিছ পশ্চাতে', এই আমাদের সমাজ-সংসারের অঙ্গ হয়ে আছে, তাদের জন্য 'কিছু' করবার পরিকল্পনা 'হঠাৎ' আমাদের মাথার মধ্যে উদয় হয়েছে, যেন এটি এক নতুন জ্ঞান লাভ, নব্য বোধ, যার বাস্তবায়ন জরুরি। এমন এক মানবতাবাদী (আমাদের নিশ্চয়ই এই সমকালে মানুষের জন্য প্রাণ কাঁদা কত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার কথা মনে পড়ে যাবে, যারা কোটি ছুঁই ছুঁই টাকা বা তার চেয়ে বেশি দামের গাড়িতে চেপে দুঃখদুর্দশা নিবারণী প্রকল্পে ঝাঁপিয়ে পড়েন।) সমাজের এক অংশের চিন্তা ও উদ্যোগের বিষয়টা সেই তখন রবীন্দ্রনাথ ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি সংস্কৃত ভাষার ছোট একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এ বিষয়ে তাঁর পিঠ-চাপড়ানো বাহবা দানের পরিবর্তে কপালে ভাঁজ-ফেলা উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন:

আমরা পরের উপকার করিব মনে করিলেই উপকার করিতে পারি না। উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই। যে বড়ো সে ছোটোর অপকার অতি সহজে করিতে পারে, কিন্তু ছোটটার উপকার করিতে হইলে কেবল বড়ো হইলে চলিবে না–ছোটো হইতে হইবে, ছোটোর সমান হইতে হইবে। মানুষ কোনোদিন কোনো যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণরূপেও না, কেবলমাত্র প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে।

কিন্তু আমরা লোকহিতের জন্য যখন মাতি তখন অনেক স্থলে সেই মত্ততার মূলে একটা আত্মাভিমানের মদ থাকে। *আমরা লোকসাধারণের চেয়ে সকল বিষয়ে বড়ো, এই কথাটাই রাজকীয় চালে সম্ভোগ করিবার উপায় উহাদের হিত করিবার আয়োজন। এমন স্থলে উহাদেরও আহত করি, নিজেদেরও হিত করি না।*

(বাঁকা-হরফের আলাদা জোর বর্তমান রচনাকারের)

রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত বা উচ্চারণ এমন সরল অথচ তীক্ষ্ণ, যুগপৎ এমন প্রবলভাবে শতাব্দীপ্রাচীন এবং সমকালিক যে, তাঁর এই বাক্যসমষ্টির কোন অর্থ সম্প্রসারণের প্রয়োজন নেই। আমরা সহজে যা বুঝতে পারি তা হল, রবীন্দ্রনাথ কী স্বচ্ছ ও সাবলীলভাবে মানবসমাজের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বুঝতে পারতেন। সরলীকরণের ধুয়োয় কবির বা সমাজভাবুকের এমন তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে তো ব্যক্তি বা সংস্থার হিতসাধনের উদ্যোগসমূহকে সীমিত করার নির্দেশনা বলে বিবেচনা করা যাবে না। রবীন্দ্রনাথ যা বলতে চেয়েছেন তার জন্য হয়ত তাঁর সমকালীন আর এক কবির অতিপরিচিত একটি গানের পংক্তি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। 'সবারে বাসরে ভালো, নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে'। আত্মাভিমান এবং নিজেকে অন্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বা দানপ্রবণ ভাবনার মধ্যে 'মনের কালো' লুকিয়ে থাকে। আমরা প্রচারের মাধ্যমে নিজেকে জাহির করার অহংবাদী প্রচেষ্টায় ভাবি, লোকহিতের কর্মকাণ্ডে অন্যের কাছে দর্শনীয় করে তুললে তার বিবিধ প্রভাব পড়ে, যেমন, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুবান্ধব, অচেনা অগণিত টেলিভিশন দর্শক ও সংবাদপত্র পাঠক জানলো এমন মানবধর্মের কথা, আবার হয়তো বা এর দ্বারা অন্যদের হয় ঈর্ষান্বিত করা যাবে, না হয় উৎসাহিত করা যাবে, যাতে তারাও একই রকম মানব ধর্মাচারী হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে যা বলতে চেয়েছেন তা হল, হিতসাধনের সঙ্গে একটা আবশ্যিক উপাদান থাকতে হবে, তা হল, প্রীতি। লোকসাধারণ অথবা সাধারণ মানুষ কোনকিছু গ্রহণ করবার সময় যদি বুঝতে পারে যে এর সঙ্গে প্রীতির সুখবন্ধন জড়িত আছে, তাতে তাদের অন্তর ভরে ওঠে, "কিন্তু [শুধু] হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়"। রবীন্দ্রনাথ সাধারণ একটা লোক-অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, এবং তা-ও অদ্যাবধি আমাদের সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এটা অনেকসময়ই ঠিক যে, মানুষ যার কাছে ঋণী, তাকে পরিহার করার চেষ্টা করে। ক্ষেত্র বিশেষে এর মধ্যে স্বার্থবাদী চিন্তার অস্তিত্ব থাকলেও, প্রায়ই দেখা যায়, যে ঋণী, তার যে ঋণ পরিশোধ (বাস্তব এবং আলঙ্কারিক উভয় অর্থে) করবার সামর্থ্য নেই। তারা যে লোকসাধারণ, অক্ষম ও বঞ্চিতদের দলে। এটা বোঝানোর জন্য রবীন্দ্রনাথ বাঙালি সমাজের অতি-পরিচিত মহাজনী ব্যবস্থার উদাহরণ টেনেছেন। ঋণ গ্রহণ করলে মহাজনকে সুদ দিতে হয়, ঋণ শোধ করবার সামর্থ্য না থাকায়, সুদ বৃদ্ধি পেতে পেতে তা আসলকে অতিক্রম করে। মহাজন তো আর ছাড় দেয় না। এই এখনকার বাংলাদেশে কত অর্থবহ নামধারী সুউচ্চ ভবনে সংস্থাপিত মহাজন আছে, তাদের মানবহিতৈষণার নানা প্রচেষ্টার সঙ্গে ঋণগ্রহীতাকে কোন ভাবেই ছাড় না দেবার কত যন্ত্রণাদায়ক গল্পই তো আমরা খবরের কাগজের পাতায় দেখতে পাই। অথবা শুধু যদি ধর্মীয় বিচারে পবিত্র মাস রমজানের কালে মানুষকে কিছু সাহায্য করবার, ইফতার বিতরণ করবার অথবা এতিম বা পথশিশুদের সঙ্গে রাষ্ট্রনেতাদের ইফতার গ্রহণের সুবাদে অমন সব ইসলাম ধর্মাবলম্বী 'লোকসাধারণ' যে খুব প্রীত বোধ করেন তা নয়, তারা বরং অমন নিরাপদ প্রাসাদে বেশ ভীত বোধ করেন। আর টেলিভিশনের কল্যাণে আমন্ত্রণকর্তার ফলাও প্রচার ঘটে এবং আখেরাতে অতিরিক্ত কিছু প্রাপ্তিও হয়ত নিশ্চিত হয়। এই মাসের জাকাত প্রদান ও কোরবানির ঈদে মাংস বিতরণের মধ্যেও দাতার সঙ্গে গ্রহীতার দূরত্ব প্রকটভাবে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত এই রচনাটির ছত্রে ছত্রে পরিহাসের দেখা মেলে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাহিত্য-বিচারে এটাকে ব্যঙ্গাত্মক রচনা বা সাধারণভাবে স্বীকৃত স্যাটায়ার বলে ভাবলে চলবে না। একদিকে, রবীন্দ্রনাথ লোকহিতৈষণার আকস্মিকভাবে বর্ধমান প্রবণতার সামাজিক ঝুঁকি সম্পর্কে তার নিজের সুস্পষ্ট উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন, তেমনি 'সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী'র (আমাদের দেশের সমসাময়িক উন্নয়ন বলয়ে নিত্যব্যবহৃত শব্দনিচয়) আত্মসম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতার বিষয়টিও প্রতিফলিত হয়েছে। লোকহিতের উদ্যোগকে যদি রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতালব্ধ ভাবনা ও কর্মপ্রক্রিয়ায় নেপথ্য ভাষ্য (পরবর্তী কালে পতিসরের সমবায় প্রতিষ্ঠার মত হিতকরী প্রকল্প ও বোলপুরে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠায় যার বাস্তব ছাপ পড়েছে) হিসেবে বিবেচনা করি, তা হলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বা দরিদ্র লোকসমাজের আত্মসম্মান ও প্রীতিলাভের অধিকারকে তাঁর সামগ্রিক দার্শনিক চিন্তার মৌলিক অংশ হিসেবে বিচার করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে 'সমাজহিতৈষী' বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী, যারা প্রধানত বামপন্থায় বিশ্বাসী না হলেও, তার অনুসারী, তেমন ব্যক্তিরা নানাভবেই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, তাঁর যে মানব সংবেদনশীলতা, পরিণতিতে তা আঙ্কিকভাবে সামাজিক ন্যায়-বিচারের পক্ষে যায় না, তার মধ্যে বরং তথাকথিত ধনতান্ত্রিক হিতকরী প্রকল্পের ছায়া দেখা যায়। জমিদার-তনয় হবার সুবাদে তাঁকে অনেক গঞ্জনা সইতে হয়েছে। কিন্তু আমি যে রচনাটিকে উপজীব্য করে লিখছি, তার মূল ভাবটা অনুসরণ করলে বোঝা যাবে, বিবিধ দেশী-বিদেশী তাত্ত্বিকতার কূটকচালের বাইরে রবীন্দ্রনাথের লোকচিন্তা কত গভীরভাবে মানবতান্ত্রিক ছিল।

এই লেখার আরম্ভের দিকে আমি ১৯০৫-এর বঙ্গবিভাগের সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেছি। এ নিয়ে কোন বিশদ আলোচনার প্রয়োজন পড়ে না যে, বঙ্গভঙ্গের বৃটিশ প্রশাসনিক কর্মসূচিই কবিকে সবচেয়ে প্রবলভাষী বাঙালি হিসেবে আমাদের সামনে হাজির করে। স্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারছিলেন, এক ভাষা, এক প্রাণ, এক সংস্কৃতি, এক জীবনধারার বাঙালিসমগ্রকে (তার নানা বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক প্রকাশকে অন্তর্ভুক্ত করেই) বিভাজনের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের যে রাজনৈতিক অভিলাষ আছে, তা সফল হলে 'বাঙালির ঘরে যত ভাই-বোন' তারা আর এক হতে পারবে না এবং বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতির সংহার প্রক্রিয়া শুরু হওয়া মানে বহু শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা সভ্যতার নিজস্ব ধারাবাহিকতায় আরোপিত আক্রমণের সূচনা ঘটবে। আমরা সবাই ওই কালে লিখিত রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ' পর্যায়ের গানগুলির কথা জানি। এসব গানে দেশমাতার জন্য ভালোবাসার গভীর প্রতিফলন ঘটেছে। এবং অনেকগুলি গানের সুরনির্মিতি ঘটেছে লোকগানের সুরে। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের কথাও আমরা এই সূত্রে স্মরণ করতে পারি। ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালে সেসবের জন্মকথা প্রোথিত, ইতিহাসের অপ্রত্যাশিত এক আঘাতে কবি কত গভীরতামুখী ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠতে পারেন, তার প্রমাণও ওই গীতিগুচ্ছ। আমরা তো রবীন্দ্রনাথের রাখি-বন্ধন উৎসব পালনের কথাও জানি।

'লোকহিত' প্রবন্ধে লোকসাধারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বঙ্গবিভাগের প্রসঙ্গটাও এসেছে। এবং তা থেকেই একদিকে রবীন্দ্রনাথের সমাজবাদী ইতিহাসচেতনার ধারণা পাওয়া যায়, অন্যদিকে, ইতিহাসকিষ্ট মানবতাবাদের সুস্পষ্ট প্রকাশও লক্ষ করতে পারি আমরা। বিংশ শতকের প্রারম্ভ অথবা তার পূর্বের শতকের সবটা জুড়ে, রবীন্দ্রনাথ যাদের লোকসাধারণ গোত্রভুক্ত করছেন, অর্থাৎ পাড়ার শেষ প্রান্তে যাদের অধিবাস, উচ্চ শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে পাওয়া অবমাননাকে যারা নিয়তি কিংবা নিবারণরহিত শাস্ত্রীয় বিধান বলে বিবেচনা করতেই অভ্যস্ত ছিলেন,

এদেশের ইসলাম ধর্মাচারীদের সুবিপুল অংশ তারই গোত্রভুক্ত ছিলেন। নিজে প্রবলভাবে বঙ্গভঙ্গের বিরোধী ছিলেন যদিবা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমাজ-দার্শনিক বোধের মাধ্যমে একথাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের এমন বিপজ্জনক উদ্যোগে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল বাঙালি যে প্রতিরোধ আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়ে (সামাজিক সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক) এক কাতারে সামিল হল না, তার কারণ বাংলাদেশের মুসলমান সমাজকে সেদিনের অগ্রবর্তী এবং অনেকটাই ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু সমাজ 'লোকসাধারণ' গোত্রভুক্ত করে দেখতো। তাই বঙ্গবিভাগ ঠেকাতে, 'আমাদের এক ভাষা, আমাদের এক সাহিত্য-সংস্কৃতি' এমন সমাজঘনিষ্ঠ প্রচারণা সেকালের বৃহত্তর মুসলিম সমাজকে ইতিবাচকভাবে আন্দোলিত করতে পারেনি। এ এক নিষ্ঠুর অগ্রহণযোগ্য কিন্তু সামাজিক ও ঐতিহাসিক সত্য। রবীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্টভাবে একথা বলতে চেয়েছেন যে, আকস্মিকভাবে 'মুসলমানদের ভাই বলিয়া আহ্বান করিলে' ওই ডাক-শোনা লোকসাধারণ তাতে কোন আস্থা পায় না, কারণ, ওই আহ্বানে সত্যিকারের ঐতিহাসিক সামাজিক প্রীতির কোন লক্ষণ দেখা যায় না। 'লোকহিত' প্রবন্ধের প্রাথমিক যুক্তি পর্যায় উপস্থাপনের পরই রবীন্দ্রনাথ এই দিকটার প্রতি পাঠককে নির্দেশনা দিয়েছেন।

> অল্পদিন হইল, এ সম্বন্ধে আমাদের একটা শিক্ষা হইয়া গেছে। যে কারণেই হউক যেদিন স্বদেশী নিমকের প্রতি হঠাৎ আমাদের অত্যন্ত একটা টান হইয়াছিল সেদিন আমরা দেশের মুসলমানদের কিছু অস্বাভাবিক উচ্চস্বরেই আত্মীয় বলিয়া, ভাই বলিয়া, ডাকাডাকি শুরু করিয়াছিলাম।
>
> সেই স্নেহের ডাকে যখন তাহারা অশ্রুগদগদ কণ্ঠে সাড়া দিল না তখন আমরা তাহাদের উপর ভারি রাগ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, এটা নিতান্তই ওদের শয়তানি। একদিনের জন্যও ভাবি নাই, আমাদের ডাকের মধ্যে গরজ ছিল কিন্তু সত্য ছিল না। মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-একটা সাধারণ সামাজিকতা আছে, যে সামাজিকতার টানে আমরা সহজ প্রীতির বশে মানুষকে ঘরে ডাকিয়া আনি, তাহার সঙ্গে বসিয়া খাই, যদি বা তাহার সঙ্গে আমাদের পার্থক্য থাকে সেটাকে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে দিই না—সেই নিতান্ত সাধারণ সামাজিকতার ক্ষেত্রে যাহাকে আমরা ভাই বলিয়া, আপন বলিয়া মানিতে না পারি, দায়ে পড়িয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ভাই বলিয়া যথোচিত সতর্কতার সহিত তাহাকে বুকে টানিবার নাট্যভঙ্গি করিলে সেটা কখনোই সফল হইতে পারে না।
>
> এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের, এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর-এক সম্প্রদায়ের তো পার্থক্য থাকিবেই, কিন্তু সাধারণ সামাজিকতার কাজই এই—সেই পার্থক্যটাকে রূঢ়ভাবে প্রত্যগোচর না করা। ধনী দরিদ্রে পার্থক্য আছে, কিন্তু দরিদ্র তাহার ঘরে আসিলে ধনী যদি সেই পার্থক্যটাকে চাপা না দিয়া সেইটেকেই অত্যুগ্র করিয়া তোলে, তবে আর যাই হউক, দায়ে ঠেকিলে সেই দরিদ্রের বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে যাওয়া ধনীর পক্ষে না হয় সত্য না হয় শোভন।

রবীন্দ্রনাথ এর চেয়ে স্পষ্ট করে আর বলতে পারতেন না, তা করলে এই রচনা একটা প্রচারপত্র বা লিফলেট হয়ে যেত। ভাবতে ভালো লাগে, শুনলে কেমন স্মৃতিকাতরতায় আচ্ছন্ন হয়ে যাই, এমন লোকগানের কথা স্বভাবতই মনে আসে,—আগেকার দিনে হিন্দু-মুসলমান কী অসাধারণ সম্প্রীতিতে 'সুন্দর দিন কাটাইতাম'। হিন্দু-মুসলমান একত্রে ভ্রাতৃভাবে বা ভগিনীভাবে বসবাস করা, সাম্প্রদায়িকতার চিন্তাকে নির্বাসন দেয়া, অতীত, অনাদি অখণ্ড, লোকজ সংস্কৃতির বিষয় ও সুরে গাওয়া এই গান যখন গীত হতে দেখি, সে শহীদ মিনারে হোক অথবা শিল্পকলা একাডেমির মত কোন চার-দেয়াল ঘরে মিলনায়তনে, ঢাকার তাবৎ নাগরিকবৃন্দ হাতে তালি দিয়ে সঠিক লয়ে তাতে গলা মেলান। তখন লোকসাধারণের একটা সত্যিকারের স্বাদ পাই। বাঙালি সমাজে হিন্দু-মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তরিক সামাজিকতার কিছু দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই আমরা আবিষ্কার ও উদ্ধৃত করতে পারি, কিন্তু তার মাধ্যমে নিষ্ঠুর অমানবতান্ত্রিক ও ব্যাপক বিভেদের ধ্রুপদী বাস্তবতাকে আড়াল করতে পারি না। একথা সত্য যে, বঙ্গভঙ্গের হুমকি রবীন্দ্রনাথকেও তাৎক্ষণিকভাবে অনেক বেশি সচেতন ও ব্যথিত করেছিল। সামাজিকতার মধ্যে ব্যবহারিক ও সত্যিকারের প্রীতি থাকতে হবে, আর তা থাকলেই সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্যজনিত যেসব দূরত্ব তার একটা রাষ্ট্রীয় সমাধান জুটতে পারে। ওই রচনায় রবীন্দ্রনাথ এতটাই স্পষ্টবাক ছিলেন যে, তিনি একটা অত্যন্ত মর্মান্তিক ও স্থূল উদাহরণ সন্নিবেশিত করেছেন। তিনি লিখছেন, এমনকি ওই ভাবপ্রবাহে উত্তাল স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, যখন পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানদের ভ্রাতা সম্বোধন করে বাঙালির ঐক্য-গড়ার আন্দোলন চলছে, সেই "তখন এক হিন্দু স্বদেশী-প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাঁহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই"। 'লোকসাধারণ' বিষয়ে রবীন্দ্রভাষার সন্ধানে আরো ব্যাপক অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই।

১৯৪৭ সালে বাংলা ভাঙলো, অনেক রক্তের বিনিময়ে, অনেক উদ্বাস্তুর এদিক-ওদিক যাওয়া-আসার করুণ বাস্তবতা নিয়ে, অনেক তুলসী গাছের আত্মকাহিনীর জন্ম দিয়ে। ১৯৭১ সালে যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে সম্প্রদায়-নির্বিশেষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের নব উদ্বোধনের মাধ্যমে একটা জাতি তার গৌরবময় অতীতকে ফিরিয়ে আনলো বীতঅমানিশা ভবিষ্যতের প্রত্যাশায়। সমকালের এই ইতিহাসের আদর্শিক ভাঙাগড়া এবং রাজনীতির চতুর খেলার বিস্তারিত বিবরণ সবার জানা। এবার শুধু ধীরে ধীরে (সেই ১৯৪৭-এ আরম্ভ হয়ে) বাংলাদেশ নামক গর্বিত স্বাধীন রাষ্ট্রে মুসলমানদের পূর্বের জায়গাটা বরাদ্দ হল পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের জন্য। এদেশের একটি রাষ্ট্রীয় আইনের শিরোনামে হিন্দুর সম্পত্তির

বিশেষ-অংশকে শত্রুর সম্পত্তি বলে ঘোষণা বলবৎ করা হয়েছে। সারা দেশের সব অঞ্চলে শাখা-ছড়ানো একটা বড় বাণিজ্যিক ব্যাংক আছে, যেখানে হিন্দুরা কোন হিসাব খুলতে পারে না। আমরা গরবের সঙ্গে ইসলামী উম্মাহ জাতীয় এক পুরাণোপম সামাজিক-অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর সদস্য বলে নিজেদের জাহির করতে ভালবাসি। একবারও ভাবি না, এমন সব সামাজিক কর্মকান্ডের মধ্যে কত গভীর অনাচার লুকিয়ে আছে, সেসবের মূর্ত-বিমূর্ত প্রকাশ কীভাবে এদেশের হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মের জনগোষ্ঠীকে নীরবে নিভৃতে আহত করে। প্রকৃতপক্ষে, এই সব আচরণ সাধারণভাবে এদেশের ব্যাপক অমুসলমান সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে অবিরতভাবে সন্ত্রস্ত করে রাখে। অথচ যারা এমন বিভেদপন্থী আচারের প্রবক্তা, তারা বিদেশীদের সঙ্গে বৈঠকের সময়, এমনকি পূজানুষ্ঠানের মধ্যে সদলবলে এসে দাবি করতে থাকে, বাংলাদেশ এক মহান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। সম্প্রদায় নির্বিশেষে আমরা অতিশয় ভালো আছি। হিন্দুর মন্দিরের জন্য বিরাট অঙ্কের টাকা দিই সরকারি কোষাগার থেকে, কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করে বুঝিয়ে দিই, তোমরা 'লোকসাধারণ', তোমাদের কল্যাণের জন্য আমাদরে চিত্ত ও হস্ত প্রসারণে উদারতার কোন অভাব নেই। কিন্তু রবীন্দ্র-কথিত সেই প্রীতি যে এখানে নেই, এখানে যে সংখ্যালঘুদের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠের আত্মাভিমান অনুক্ত থাকে না, তা বুঝতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ভদ্র সম্প্রদায়ের অভ্যাসের মধ্যেই আছে লোকসাধারণকে হেয় ও করুণাপ্রার্থী বলে বিবেচনার করার প্রবণতা। ওই কালে, আজ থেকে প্রায় এক শত বছর আগে, ভদ্র সম্প্রদায়ের সহজাত লক্ষণ ছিল আর্থিক স্বাচ্ছল্য এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্য নিজগোষ্ঠীর ওপর স্ব-আরোপিত আভিজাত্য। ওই ভদ্র সম্প্রদায়কে আমরা দেখতে পাই নানা সময়ের রাষ্ট্রীয় ভোজসভায়, গুরুগম্ভীর সম্মেলনে, বঙ্গভবনে আমন্ত্রিতদের তালিকায়। তারা যেমন 'বাঙালি' পরিচয় অতিক্রম করে, পারলে তাকে আড়াল রেখে সংখ্যাগুরুর ধর্মীয় পরিচয়ের সমসাময়িক ব্যাজ পরতে আগ্রহী, তেমনি, নিজ সম্প্রদায়ের লোকসাধারণকেও দান-অনুদান ও এতিমখানা এবং মাদ্রাসা-প্রতিষ্ঠার মতো জনহিতকরী প্রকল্পের উপকারভোগী করে গড়ে তুলতে চায়। তাতে আন্তরিক প্রীতির লেশমাত্র নেই, আছে আত্মাভিমান ও আত্মপ্রচার, আজকের, সমকালের ভদ্রসমাজ যে লোকসাধারণ থেকে আলাদা হবার প্রয়াস ও প্রত্যয়ে নেমেছে, তার জন্য ঢাকা বা বাংলাদেশের বড় বড় শহরের আবাসিক মানচিত্র ও সামাজিক-অর্থনৈতিক বৃত্তের অনিঃশেষ বিবর্তনের দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

যারা দিন দিন ক্রমবর্ধমানভাবে প্রকৃতিভক্ষক হয়ে উঠছে, আর তাদের তৈরি সস্তা শ্রমবাজারে নিযুক্ত শ্রমিক যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয় বিষাক্ত গ্যাসের হননপ্রক্রিয়ায়, অথবা বিকাশমান তৈরি পোশাকের কারখানায় অভ্যন্তরে লোকসাধারণভুক্ত কর্মজীবী দরিদ্র নারী যখন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায় এবং এমন 'অ-ভদ্র' সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মৃত্যুর হার যখন দিন দিন বাড়তে থাকে, তখন লোকহিতার্থে মৃতদের পরিবারকে কয়েক হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয়া হয়। এবং হতভাগ্য লোকসাধারণকে ওই দান গ্রহণ করতে হয় অনিবার্যভাবে এবং আমাদেরও তা বাধ্যতামূলকভাবে দেখতে হয় টেলিভিশন পর্দার উৎপীড়নে। যে দানে প্রীতির কোন উপাদান নেই, যে দানে সংবেদনশীলতা বা সমাত্মীয় সহানুভূতির কোন স্থান নেই। যে দানে বোঝা যায়, লোকসাধারণের সামাজিক অবস্থান কী করুণভাবে ভঙ্গুর এবং বিভক্তি বিলাসী সমাজ সংগঠনে তারা কতটা দূরবর্তী!

ইদানীং সব টেলিভিশনের বহুবর্ণিল পর্দায় লোকসাধারণকে দেখা যায় চমকপ্রদ বৈচিত্র্যে। অভিনব সব চমকপ্রদ প্রকল্প বটে। মধবিত্ত-নিম্নবিত্ত কেমন বহুযুগ চর্চিত তোষণ-পৃষ্ঠপোষকতার ভঙ্গিতে বাহবা দেয়। আধুনিক সব প্রযুক্তির কল্যাণে মুঠোফোনের মাধ্যমে হাজার হাজার বার্তা জমা হয় তাদের সপক্ষে, আর সেসব পাঠানোর জন্য লাভ চলে যায় ভিনদেশী বিনিয়োগকারীর হিসাবে। তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে কত দূর-দূরান্তের মানুষকে কাছে পাওয়া যাচ্ছে, ওই দলিত, ওই প্রপীড়িত, শূদ্র, অপাংক্তেয় লোকসাধারণ। হতদরিদ্র কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী টেলিভিশনের পর্দায়, গাইছে, অভিনয় করছে। টেলিভিশন চ্যানেল জনসাধারণের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। আহা, তাতে তো প্রকৃত লোকহিত সাধিত হচ্ছে। অথচ এইসব অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য ভোগবাদী পণ্যউৎপাদক ব্যাপক বিজ্ঞাপন দিচ্ছে পণ্যের বিপণনের জন্য। কিন্তু তারাও দাবি করেন, এসবই হচ্ছে লোকহিতার্থে। সংশ্লিষ্ট চ্যানেল লাভের অঙ্ক বাড়িয়ে নিচ্ছে লোকসাধারণকে ছোট পর্দায় উপস্থাপন করে। আর ওই লোকসাধারণের মুষ্টিমেয় ক'জন নানা পুরস্কার পাওয়ার অভিঘাতে মনস্তাত্ত্বিকভাবে শিকড় থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। লোকহিতের মূলমন্ত্র কোন পথে যে উধাও হয়ে যায়! পোষাকশিল্প, নির্মাণশিল্প, রিক্সাচালক সবাই কতই না পুলকিত হয়, নিজেদের হয়ত সম্ভাষিত গোষ্ঠী হিসেবে বোধ করে অভিজাত ভদ্র সম্প্রদায়ের টেলিভিশনের পর্দায়। পিৎজা এবং কোক খেতে খেতে ওই সম্প্রদায়ের পরবর্তী প্রজন্ম কোমর দোলায়। কত না প্রচেষ্টা লোকসাধারণকে অস্পৃশ্য অবস্থা থেকে অভিজাত্যের বাহারী দ্বারে আনয়নের। কিন্তু এই সব উদ্যোগের কালে, এই কঠিন সমকালে বার বার রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ে। এইসবের ভেতর কতটুকু প্রীতি আছে, কতটুকু পারস্পরিক সম্মান আছে, তাদেরকে ভাই-বোন বলে গ্রহণ করার কতটুকু মানবিক আকুতি আছে, এমন অনেক জিজ্ঞাসা থেকেই যায়।

রাত্রি প্রহর অনেক হল, কোন উত্তর নাই।

শফি আহমেদ
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এ এম রাশিদুজ্জামান খান

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও শোভন কর্ম-পরিবেশ

যে কোন দেশের অর্থনীতিতে শ্রম তথা শ্রমিক এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। উৎপাদনের অন্যতম উপকরণ হলো শ্রম। একথাতো স্বতঃসিদ্ধ যে শ্রমই বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। এঙ্গেলস-এর মতে 'শ্রমই মানুষকে মানুষ করেছে'। শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না। আর এই শ্রমের সাথে যারা জড়িত তারাই শ্রমিক। দেশ তথা অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নতি-অগ্রগতি অনেকটাই নির্ভর করে এই শ্রমিকের শ্রমের উপর।

অথচ পৃথিবীর অতীত ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় পুঁজির মালিকেরা সবসময় শ্রমিকের অধিকার নিয়ে কমবেশি ছিনিমিনি খেলেছেন। আর শ্রমিক তার ন্যায্য অধিকার আদায় করার জন্য জান বাজি রেখে আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।

আট ঘন্টা কাজের দাবির কাগুজে স্বীকৃতি থাকলেও হে মার্কেট স্কয়ারের বিশাল সমাবেশে মালিক ও সরকারের সশস্ত্র বহিনীর নির্বিচার লাঠিচার্জ ও গুলিতে শ্রমিকের রক্তে রক্তাক্ত 'মে দিবস'-এর ১২৭ বছর পরেও বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রে কর্মঘন্টা আট ঘন্টায় সীমাবদ্ধ নেই, কোথাও কোথাও তা ১৫ ঘন্টা পর্যন্ত রয়েছে।

নানা দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে কাটছে দেশের প্রায় পাঁচ কোটি শ্রমিকের জীবন। শ্রম শক্তি যে হারে বাড়ছে তার তুলনায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। আর এর ফলে 'ক্রাউডিং-ইন'-এর প্রভাব হিসাবে সস্তা হয়ে যাচ্ছে শ্রম বাজার। মিলছে না ন্যায্য মজুরী। লঙ্ঘিত হচ্ছে শ্রম আইন। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাবে অকালে ঝরে পড়ছে অনেক তাজা প্রাণ। শোভন কর্ম-পরিবেশ কোন কোন ক্ষেত্রে স্বপ্নমাত্র। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, শ্রমজীবী মানুষের বেশির ভাগই এখনো ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও শ্রম আইনের আওতাধীন নয়।

২০১০ সালে শ্রমশক্তির জরিপ অনুযায়ী, দেশে ১৫ বছরের উর্ধ্ব বয়সী মোট কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ৫ কোটি ৬৭ লাখ। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৩ কোটি ৯০ লাখ এবং নারীর সংখ্যা ১ কোটি ৭২ লাখ। এই ৫ কোটি ৬৭ লাখ কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে ৫ কোটি ৪১ লাখ মানুষ কর্মরত, বাকি ২৬ লাখ মানুষ কর্মহীন। ২০১০ সালে শ্রমশক্তির জরিপ অনুযায়ী যে ৫ কোটি ৪১ লাখ মানুষ কর্মরত তাদের মধ্যে প্রায় ৫ কোটি শ্রমজীবী। কৃষি, বনায়ন ও মৎস্য ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমজীবীর সংখ্যা ২ কোটি ৫৭ লাখ আর উৎপাদন ও পরিবহন ক্ষেত্রে নিয়োজিত শ্রমজীবীর সংখ্যা ১ কোটি ৩৫ লাখ।

বিভিন্ন খাতে নিয়োজিত শ্রমজীবীদের অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সিংহভাগ শ্রমিকদের দিয়ে নামমাত্র মজুরিতে কাজ করানো হয়। তাঁদের অধিকাংশকেই কোন নিয়োগপত্র দেওয়া হয় না, ছুটির বিধান থাকলেও অধিকাংশ শ্রমিকই তা ভোগ করতে পারে না, সমকাজে সমমজুরি দেয়া হয় না- বিশেষত নারী ও শিশু শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই বঞ্চনার হার অনেক বেশী। আমাদের দেশে শ্রম আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রম আদালতের আশ্রয় নেওয়ার সুযোগ সীমিত এবং মালিক, কর্মচারী ও শ্রমিকদের মধ্যে শ্রম আইন সংক্রান্ত সচেতনতার অভাব প্রকট। মোট কথা, আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার শ্রমমান, শোভন কর্ম-পরিবেশ এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তার (উপার্জন, কর্মসংস্থান, কর্মপরিবেশ, প্রতিনিধিত্ব, দক্ষতাবৃদ্ধি, চাকুরি ও কাজের নিরাপত্তা) অধিকাংশ অনুষঙ্গ এদেশে এখনও অনুপস্থিত।

শিল্পখাতের বিকাশ সত্ত্বেও এখনও কৃষিই বাংলাদেশের মানুষের প্রধান জীবিকা। অথচ কৃষি শ্রমিকের জীবন-মান এখনও অন্যান্য শ্রমজীবীদের তুলনায় অনেক নীচে অবস্থান করছে। এদের জীবন-জীবিকা নির্ভর করে শ্রম বিক্রি করে অথবা অন্যের জমি বর্গা চাষ করে অথবা বেকার বসে থেকে। এরা নিজের শ্রমের সঠিক মজুরি পায় না, বর্গাচাষে পায় না ন্যায্য ভাগ। পায় না উৎপাদিত ফসলের সঠিক মূল্য। এদের জন্য নেই কোন সামাজিক নিরাপত্তা।

বিভিন্ন গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কৃষি শ্রমিকরা বছরে ১৫০ দিনের বেশি কাজ পায় না, অধিকাংশই ভূমিহীন, অনেকেরই বসতভিটার জমি নেই। কৃষিশ্রমিকদের জন্য ১৯৮৪ সালের কৃষিশ্রমিক (নিম্নতম মজুরি) অধ্যাদেশ বাংলাদেশে কৃষিশ্রমিকদের সম্পর্কিত একমাত্র শ্রম আইন। এখানে নিম্নতম মজুরীর হার দৈনিক ৩.২৭ কিলোগ্রাম চাল অথবা স্থানীয় বাজারে ওই পরিমাণ চালের মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ ধরা হয়েছে। এ আইনে কৃষিশ্রমিকদের জন্য 'নিম্নতম মজুরি ও মূল্য পরিষদ নামে' একটি পরিষদ গঠন করার কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত গঠিত হয়নি। এখানে বলা আছে, 'কোন কৃষিশ্রমিকের মজুরি এবং ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা গ্রাম আদালত (Village Court)-এ চলবে'। ২০০৬ শ্রম আইনে এ আইন রহিত করা হয়নি। কিন্তু বাস্তবে এর মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষি শ্রমিকরা সঠিক সময়ে মজুরি পায় না, নেই কোন নির্দিষ্ট কাজের সময়সীমা। নারী-পুরুষ মজুরি বৈষম্য এখনও বিদ্যমান, কোন কোন অঞ্চলে এই বৈষম্যের প্রকটতা ব্যাপক। সর্বোপরি নেই কোন আইনগত স্বীকৃতি, ফলে শ্রমিক হিসেবে আইনের আশ্রয় নেবার অধিকার নেই এবং শ্রমিক হিসেবে সংঘবদ্ধ হওয়া ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার নেই।

অন্যদিকে আমাদের জাতীয় কৃষিনীতিতে কৃষির উন্নয়নের জন্য সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত হলেও কৃষি শ্রমিকের বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। কৃষির উন্নয়ন হলে কৃষি শ্রমিকেরও উন্নয়ন হবে বিষয়টি এমন সরলীকৃতও নয়। কৃষি শ্রমিকের এবং গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন টেকসই করতে হলে শুধু নীতিগত দিক নির্দেশনাই যথেষ্ট নয়, এর জন্য প্রয়োজন কৃষক এবং কৃষি শ্রমিকের উভয়েরই স্বার্থ রক্ষাকারী 'কৃষিশ্রম আইন' যা রাষ্ট্র কর্তৃক ভর্তুকি ও অন্যান্য সুবিধাসহ একদিকে কৃষকের স্বার্থ নিশ্চিত করবে এবং অপরদিকে কৃষি শ্রমিকের স্বার্থকেও রক্ষা করে গ্রামীণ দারিদ্র্য দূরীকরণের অঙ্গীকারকে কার্যকর রূপ দেবে।

কৃষি শ্রমিকের ন্যায় মৎস্যখাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের অবস্থাও একইরকম দুর্দশাগ্রস্ত। এখাতেও কত শ্রমিক জড়িত রয়েছে তার সঠিক হিসাব পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন সূত্রানুযায়ী এক কোটির বেশী সংখ্যক বাংলাদেশী ব্যাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য আহরণ খাতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করছে। মহাজন ও দাদন ব্যবসায়ীদের জালে বন্দী এদের জীবন। আর দক্ষিণ বঙ্গের অধিকাংশ মৎস্য শ্রমিকের জন্য জলদস্যু ও বিভিন্ন 'বাহিনী' নামক আতঙ্ক রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে মৎস্য শ্রমিকরা প্রায়ই দুর্ঘটনার শিকার হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা মৃত্যুও বরণ করে।

চা উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প না কৃষি এ নিয়ে বির্তক থাকলেও রপ্তানী আয়ের ক্ষেত্রে চায়ের অবদান এখনও রয়েছে। দেশের মোট ১৬৩টি চা বাগানে বর্তমানে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার শ্রমিক কাজ করছে। আর এই শ্রমিকদের বিরাট অংশই নারী। এখানে মজুরি বর্তমান বাজারের তুলনায় কম বলে শ্রমিকরা মনে করে। কারো কারো মতে চা শ্রমিকরা এখনো যাপন করছে দাসের জীবন। পাঁচ/ছয় পুরুষ ধরে চা শ্রমিকরা কাজ করলেও এখনো তাদের নিজস্ব কোন ভূমি নেই। বাগান মালিকের জমিতে অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে চা শ্রমিকদের মানবেতর জীবন-যাপানের কথা শ্রম গবেষকদের গবেষণায় উঠে এসেছে।

শিল্পখাতে নানাবিধ অগ্রগতি সাধিত হলেও শিল্প ক্ষেত্রে সামগ্রিক কর্ম-পরিবেশ ও শ্রমিকের নিরাপত্তা এখনও নিশ্চিত হয় নাই। শিল্পখাতের বিভিন্ন উপ-খাতভিত্তিক উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে সর্ব প্রথম যে উপ-খাতটির নাম উঠে আসে তা হল, রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্প। বিগত শতকের ৮০ দশক থেকে শুরু করে বর্তমানে প্রায় ৫০০০-এর বেশি পোশাক শিল্প কারখানা তৈরি হয়েছে। কিন্তু পোশাক শিল্পের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে শ্রমিকের সামাজিক অগ্রগতি এখনও ঘটেনি। নিম্নতম মজুরি নির্ধারিত হলেও বেশ কিছু কারখানায় এখনও তা বাস্তবায়িত হয় নি। নিয়মিত বেতন ও ভাতাদি পরিশোধ নিয়ে প্রায়ই অনেক কারখানায় শ্রমিকদের আন্দোলন করতে দেখা যায়। কর্ম-ঘন্টা নিয়েও শ্রমিকদের রয়েছে অসন্তুষ্টি।

অনেক কারখানার সামগ্রিক পরিবেশ এখনও শ্রমবান্ধব নয়। আর তাই মৃত শ্রমিকদের মিছিলে প্রতি বছরই কিছু কিছু শ্রমিক যোগ দিচ্ছে। পত্রিকা ও বিভিন্ন উৎসের হিসাব অনুযায়ী ১৯৯০ সাল থেকে এ পর্যন্ত পোশাক কারখানায় অগ্নিকান্ডের কারণে ১৮৮০ জন শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেছে, আহত হয়েছে কমপক্ষে ৫৪৫৩ জন। কেবলমাত্র ২০১৩ সালে রানা প্লাজায় দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ১৩৩৪ জন এবং আহত হয়েছে আনুমানিক ২৫০০ জন। সিপিডি'র হিসাব অনুযায়ী ২০০৭ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ১৩০০ পোশাক শিল্প কারখানায় অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে মারা গেছেন ৩০০-এর বেশি শ্রমিক এবং আহত হয়েছে ১১০০-১২০০ শ্রমিক।

কেবলমাত্র পোশাক শিল্প কারখানাই নয়, অন্যান্য শিল্প কারখানায়ও শ্রম-আইন লঙ্ঘনের ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটছে। ট্যানারী বা চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পও বাংলাদেশের আরেকটি রপ্তানিমুখী শিল্প। দেশ বিভাগ পরবর্তী কালে দীর্ঘ প্রায় ৭০ বছরে গড়ে উঠেছে ২০০-র বেশী ট্যানারী কারখানা। অথচ এই সাব-সেক্টরের বেশির ভাগ কারখানাতেই নেই শ্রমিকের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা। এই সকল কারখানায় সরকার ঘোষিত নিম্নতম মজুরির পরিবর্তে বর্তমানে ৪ গ্রেডে শ্রমিকদের দক্ষতানুযায়ী ভাগ করে মজুরি প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে মালিক পক্ষ। নিরাপদ কর্ম-পরিবেশ নেই বললেই চলে।

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (শেড) তাদের গবেষণায় বলেছে দুই শতাধিক ট্যানারীর

অধিকাংশ শ্রমিকই ভয়াবহ রাসয়নিক দূষণের শিকার। অধিকাংশ কারখানায় শ্রমিকরা কোন ধরনের Protective-eqipment ছাড়া শ্রমিকরা কাজ করেন। এই শিল্পে কাজের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে রাসয়নিক এবং বিপজ্জনক ও ভারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার। নেই পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা, নারী পুরুষের জন্য পৃথক পায়খানা। অধিকাংশ শ্রমিকেরই নেই নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র। ফলে মালিক পক্ষ যে কোন সময় যে কোন কারণেই তাদের চাকুরিচ্যুত করতে পারেন। দীর্ঘ সময় এমনকি ২০/২৫ বছর কাজ করার পরও অনেক শ্রমিক এখনও অস্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কর্মরত। যদিও সাপ্তাহিক, বাৎসরিক, অসুস্থতাজনিত ও উৎসবজনিত ছুটি কিছু কিছু কারখানায় দেয়া হয়, তবে তা খুব অল্প সংখ্যক শ্রমিকই ভোগ করতে পারেন। আর মাতৃত্বকালীন ছুটি নারীর অধিকার হলেও কোন কোন কারখানায় বিধিমোতাবেক মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা নেই।

জাহাজ-ভাঙ্গা বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী কালে গড়ে ওঠা একটি নতুন শিল্প। জাহাজভাঙ্গা কার্যক্রমে বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক জড়িত। বেঁচে থাকার জন্য এই শিল্পের শ্রমিকদের যে অবিরাম সংগ্রামের তিক্ত অভিজ্ঞতা জোটে তাকে অন্য কোন কিছুর সাথে তুলনা করা যায় না। অভাবের তাড়নায় শ্রমশক্তির এক বৃহৎ অংশ বাধ্য হয় বিপজ্জনক এই কায়িক শ্রমে নিযুক্ত হতে। নিরাপত্তার উপকরণ না থাকার কারণে শ্রমিকদের কাজের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি বেড়ে যায়। শ্রমিকেরা স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পয়ঃনিষ্কাশন, আর্থিক নিরাপত্তা ইত্যাদি ক্ষেত্রে একেবারে ন্যূনতম সুবিধাও পায়না। তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা অধিকাংশ শ্রমিকের বেতন। প্রায়শই শ্রমিকরা মারাত্নক অসুস্থ বা আহত হয়ে থাকে কিংবা দুর্ঘটনায় মারা যায়। সাধারণত তাদেরকে শিপইয়ার্ডে কাজের ধরন এবং ঝুঁকি সম্পর্কে না জানিয়েই কাজে নিয়োগ করানো হয়। শিপইয়ার্ডের শ্রমিকরা কোন কাগজপত্র বা চুক্তির মাধ্যমে কাজ করছে না, তারা ফোরম্যান বা সর্দারের অধীনে কাজ করছে, তাই মজুরি বন্টনও এই ফোরম্যানরাই করে থাকে। জাহাজ ভাঙ্গার ৩০ হাজার শ্রমিকদের কোন চাকুরির নিয়োগপত্র নেই, কার্ড নেই, টোকেন নেই, ইয়ার্ডে শ্রমিক সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য কোন রেকর্ড রেজিস্ট্রার নেই ফলে কর্মরত শ্রমিকের মোট সংখ্যা যাচাই করা যেমন কঠিন, তেমনি যখন কোন দুর্ঘটনায় কেউ নিহত বা নিখোঁজ হয়েছে সেটাও নির্ণয় করা কঠিন। নিহত হলে শ্রমিকদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার দৃষ্টান্তও কম। এই শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রতি বছর প্রচুর রাজস্ব আয় হলেও নীতিনির্ধারকদের কাছে এদের সঠিক খবর খুবই কম পৌঁছায়।

নির্মাণ শ্রমিকরাও বাংলাদেশের শ্রমশক্তির এক বিরাট অংশ। নির্মাণ শ্রমিকদের সঠিক সংখ্যা কত তা নিয়েও রয়েছে বিভ্রান্তি। নির্মাণ শ্রমিকদের নেই কোন নিয়োগপত্র, কার্ড বা টোকেন। নেই তাদেরও মজুরির কোন নির্ধারিত কাঠামো, নেই প্রতিদিন কাজের নিশ্চয়তা। অভাব-অনটন তাদের চিরদিনের সঙ্গী। অজস্র নেইকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকে তারা। আর কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা না থাকায় অস্বাভাবিক মৃত্যুই তাদের চরম পরিণতি। বিভিন্ন সুত্র অনুযায়ী প্রতি বছর কম-বেশী ১০০ নির্মাণ শ্রমিক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করে। Safety and Rights Society (SRS) হিসাব অনুযায়ী ২০১২ সালে ১৪৯ জন, ২০১১ সালে ১৮৩ জন, ২০১০ সালে ৭৩ জন এবং ২০০৮ সালে ১০০ জন নির্মাণ শ্রমিক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যু বরণ করে।

অথচ বাংলাদেশ শুধু মৌখিকভাবেই কর্মীদের অধিকার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেয়নি, উপরন্তু অনেকগুলো আইএলও কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করে শ্রমিকের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কর্মপরিবেশের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য অঙ্গীকারও করেছে। আইএলও প্রণীত শোভন-কর্ম পরিবেশ বিষয়ক প্রতিবেদন 'নিরাপদ কর্ম-পরিবেশ' বিষয়ক সারণী থেকে থেকে যায়, ২০০৩ থেকে ২০১১ এ সময়কালে কর্মস্থলে আহত ও নিহতের সংখ্যা বাড়ছে। ২০০৩ সালে প্রতি ১০,০০০ নিবন্ধিত শ্রমিকের বিপরীতে কর্মক্ষেত্রে মৃত্যুর (Fatal injuries per 10,000 registered workers) হার ছিল ১.২৫ জন, ২০১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১.৭৪ জনে। অবশ্য কর্মক্ষেত্রে আহতের হার এ সময়কালে প্রায় অর্ধেক হ্রাস পেয়েছে (২০০৩ সালে ছিল ৫.৩৫ জন এবং ২০১১ সালে তা ২.৭৪ জন)। তবে এই সময়কালে দুর্ঘটনায় আহত হয়ে স্থায়ী প্রতিবন্ধী হওয়ার সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে (২০০৩ সালে এই সংখ্যা ছিল ২৪০ জন আর ২০১১ সালে এই সংখ্যা ৪৫৫ জন)।

সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি আর তার বিনিময়ে যে মজুরি একজন শ্রমিক পায় তাতে অধিকাংশ শ্রমিক পরিবারের পক্ষেই দারিদ্র্যের জাল ছিঁড়ে বের হয়ে আসা সম্ভব হয় না। অধিকন্তু পরিবারের প্রধান উপার্জনক্ষম ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যু বরণ করায় পরিবারটি দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়। আর তাই যদিও দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধির প্রধান উপায় হলো উৎপাদনমুখী ও সম্মানজনক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, তথাপি বাংলাদেশের জন্য এটাই একটি বাস্তবতা যে, এখানে কর্মে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। শ্রমিকদের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান এবং চাকুরি করা সত্ত্বেও অনেক শ্রমিক দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করে, যা তাঁদেরকে কর্মজীবী দরিদ্রে (Working poor) পরিণত করেছে।

নানাবিধ নিরাপত্তাহীনতা থাকলেও শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন যুক্তিসঙ্গত মজুরি নির্ধারণ ও যথাযথভাবে মজুরি প্রদান নিশ্চিত করা। ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা না গেলে শ্রমিকদের অন্যান্য অধিকার আদায় কিংবা

নিরাপত্তাহীনতার অন্যান্য অনুষঙ্গের অবসান ঘটানোও সম্ভব নয়। কাজেই শ্রমিক পরিবারের চাহিদা মেটানোর মত ন্যূনতম মজুরির বিধান যেমন সামাজিক নিরাপত্তার একটি উপাদান, তেমনি তা প্রত্যেক শ্রমজীবী মানুষের অধিকার। এছাড়া একথা সর্বজনস্বীকৃত যে, সমাজের কাঠামোগত ও বৈষম্যপূর্ণ ব্যবস্থা এবং মুনাফাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা থেকেই দারিদ্র্যের সৃষ্টি। সহজ কথায় সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের বঞ্চনা ও শোষণের বিনিময়ে অগ্রসর অংশের এগিয়ে চলা।

জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর সনদ অনুসারে প্রত্যেকেরই সন্তোষজনক (decent) উপার্জনের সুযোগ থাকতে হবে। আইএলও সনদে আরও উল্লেখ আছে যে, কাউকে তার শোভন জীবনযাত্রার- তথা মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণের মত পর্যাপ্ত উপার্জনের- চেয়ে নিম্নতম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না। ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুসারে প্রত্যেকেরই কোন বৈষম্য ব্যতিরেকে সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক চাকুরিজীবির নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম, এমন ন্যায্য অনুকূল পারিশ্রমিক এবং প্রয়োজনবোধে সেই সঙ্গে সামাজিক সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থাদি লাভের অধিকার রয়েছে (অনুচ্ছেদ ২৩)। বাংলাদেশের সংবিধানের ২০(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে "কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়" এবং ''প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেকে কর্মানুযায়ী''- এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন"।

উন্নয়নের প্রচলিত ধারণায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে চুইয়ে পড়া (trickle down) নীতি অনুসারে এ উন্নয়নের সুফল সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার কথা। কিন্তু এ যাবৎ কালে পরিচালিত উন্নয়ন কৌশলসমূহ শুধু বৈষম্যপূর্ণ সমাজ সৃষ্টি করেনি, সম্পদের কেন্দ্রীভূতকরণের মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্যও সৃষ্টি করেছে। ভারসাম্যহীন অর্থনীতির কারণে সম্পদের অপব্যবহার ও ভোগবিলাসিতায় অপচয়ের ফলে আমাদের উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ শুধু স্বপ্নই রয়ে গেছে। সরকারি উন্নয়ন নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচিসমূহ কর্মসংস্থানমুখী না হয়ে শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অভিমুখী হওয়ায় এ যাবৎ কালের অর্জন শুধু 'কর্মসংস্থানহীন প্রবৃদ্ধি' (Jobless growth)-তে পর্যবসিত হয়েছে। পাশাপাশি শ্রমিকের যথাযথ মজুরি ও শ্রম অধিকার নিশ্চিতকরণের কার্যকর নীতি ও পদ্ধতি না থাকার ফলে শ্রমিকদের এক বিশাল অংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে অমানবিক জীবন যাপন করছে। অথচ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে 'রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি' অংশে ১৪ পরিচ্ছেদে বলা আছে, 'রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে- কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা'।

বিদ্যমান আইনের অনুসরণে ব্যর্থতা এবং শ্রম আইনের দুর্বলতার পাশাপাশি শ্রমিক অধিকারের অনেকগুলো বিষয় প্রচলিত আইন দ্বারা সংরক্ষিত হয় না। বেসরকারি সেক্টরে ট্রেড ইউনিয়ন চালুর অধিকার নিশ্চিত করা হয় নাই এবং বেসরকারি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরের শ্রমিকদের বেকার ভাতা, অবসরকালীন পেনশনের ব্যবস্থা, চাকুরি বীমা, কর্মকালীন অসুস্থতা ও দুর্ঘটনায় পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার নিশ্চয়তা, অর্জিত ছুটি ও মাতৃত্ব ছুটি, ওভারটাইম প্রদানের ব্যবস্থা এবং ন্যূনতম মজুরি সমন্বয় করার কার্যকর পন্থা বাংলাদেশে এখনো অনুপস্থিত। সকল নারী ও পুরুষের জন্য স্বাধীনতা, সমতা, নিরাপত্তা ও মানবিক মর্যাদাবোধ রয়েছে এমন শোভন কর্ম-পরিবেশ এখনো বাংলাদেশে অনুপস্থিত।

শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী আর অধিকারহীনতার কারণেই আজ মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে যোজন যোজন ব্যবধান। এই শ্রমজীবী মানুষ বিভিন্ন সৃষ্টির নির্মাতা হিসেবে যে ভূমিকা পালন করে, তা শিল্প মালিকদের অনেকেই বুঝতে চান না। একজন শ্রমিকই জানেন একটি শিল্প-কারখানার সাথে তার রুটি-রুজির সম্পর্ক অভিন্ন। তারা কাজের বিনিময়ে চায় সময়মতো ন্যায্য মজুরি। এ ন্যায্যতার মাপকাঠিও দুবেলা দুমুঠো ভাত খাওয়া আর মোটা কাপড় পরার নিশ্চয়তার সমান, শ্রমিকের পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তার সমান, শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার ও সামাজিক মূল্যবোধের স্বীকৃতির সমান। শ্রমিকরা চায় যাতে রানা প্লাজার মত কোন কারখানা ধসের কারণে তাদের মৃত্যু না হয়, তাজরিন ফ্যাশন'র শ্রমিকদের মত তারা যেন না পুড়ে মরে, র‍্যাংগস ভবনে কর্মরত শ্রমিকদের ন্যায় কোন নির্মাণ শ্রমিক যাতে মারা না যায়, বয়েলার বিস্ফোরণে যাতে কোন চাতাল শ্রমিকের শরীর ঝলসে না যায়, জাহাজ ভাঙ্গার সময় প্লেট চাপায় কোন শ্রমিক যেন পঙ্গু না হয়ে যায়।

মালিক-শ্রমিকের আস্থাহীনতার সুযোগে আমাদের দেশে শিল্প খাত বিকাশ হচ্ছে না, বরং গড়ে উঠছে বিদেশী পণ্যের বাজার। শ্রমিকদের অনাস্থা নয় বরং আস্থায় নিয়েই শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ সম্ভব। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার তথা কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও শোভন কর্ম-পরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমেই সম্ভব শিল্প খাতের বিকাশ ঘটানো এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করা। আর এই উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে সুদৃঢ় হবে জাতীয় অর্থনীতি, সমৃদ্ধি হবে দেশ।

এ এম রাশিদুজ্জামান খান
উন্নয়নকর্মী

শাওয়াল খান

নারীর কর্মঘন্টা অর্থনীতির মূলস্রোতে সম্পৃক্ত হবে কবে?

পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি, বহুল প্রচলিত প্রবাদ, তবু প্রশ্নবিদ্ধই থেকে গেল। কারণ একটাই। শ্রমশক্তি ব্যয়কে যদিও পরিশ্রম বলা হয়, তবুও কারো কারো শ্রমশক্তি ব্যয়কে আমলেও নেয়া হয় না। এটা সমাজের মানসপটে এমনভাবে ঢুকিয়ে দেয়া যে, তাতে মূল প্রশ্নটাই চাপা পড়ার দশা। একবার খোলা মনে তাকিয়ে দেখুন, বাংলাদেশের নারীসমাজ যে গৃহস্থালির কাজে সময় ব্যয় করেন এতে কি পরিশ্রম করতে হয় না? এই পরিশ্রমকে কি কর্মঘন্টা হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়?

এদেশের নারীসমাজের (গৃহিণী) গৃহস্থালির কাজের অর্থমূল্য হিসাব করা হয় না বলেই সমাজ একে কর্মঘন্টা হিসেবে আমলে নেয় না। নারীর গৃহস্থালির কাজকর্মকে প্রাকৃতিক নিয়ম বলেই চালিয়ে দিতে অভ্যস্ত সমাজ। এই আমলে না নেয়া কর্মঘন্টা নারীকে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত করছে এবং সমাজে যে তার অবদান সেটাকেও আড়াল করছে। নারীর গৃহস্থালির কাজে ব্যয় করা সময় অর্থমূল্যে হিসাব করা গেলে অর্থনীতিতে নারীর অবদান আড়ালে থেকে যেত না। উপরন্তু, জিডিপি (মোট- দেশজ উৎপাদান) অনেক বেশি হতো। দেশের এক গবেষণায় এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশেও একই অবস্থা বলে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) এক গবেষণায় বলা হয়েছে (*প্রথম আলো*-৮ মার্চ ২০১৪)।

বাংলাদেশ সরকারের হিসাবে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। কৃষি, শিল্প, উদ্যোক্তা, অফিস-আদালতসহ সব কর্মক্ষেত্রেই নারীরা কাজ করছেন।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০১০ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে এক কোটি ৬২ লাখ নারী কর্মক্ষেত্রে রয়েছেন। ২০০৬ সালে এই সংখ্যা ছিল এক কোটি ১৩ লাখ। অর্থাৎ ওই চার বছরে প্রায় ৪৯ লাখ নারী শ্রম বাজারে প্রবেশ করেছেন।

২০১২ সালে প্রকাশিত এই জরিপ অনুযায়ী গৃহস্থালির কাজ করে কোনো মজুরি পান না ৯১ লাখ নারী। তাদের মধ্যে কেউ পরিবারের সদস্য, আবার কেউ গৃহকর্মী। আবার মজুরি দেওয়ার ক্ষেত্রেও নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। পুরুষের চেয়ে নারীদের কম মজুরি দেওয়া হয়।

শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৮ লাখ ৪৯ হাজার নারী দিনমজুর রয়েছেন। তারা পুরুষের সমান কাজ করেও মজুরি কম পান। পুরুষ দিনমজুরেরা পান গড়ে ১৮৪ টাকা, নারী পান ১৭০ টাকা। তবে শহরে নারী-পুরুষের মজুরির বৈষম্য কিছুটা কম। এখানে নারী-পুরুষ গড়ে প্রায় সমান মজুরি পান। শহরের পুরুষ দিনমজুরেরা পান ২০০ টাকা, নারী পান ১৯৮ টাকা। শহরে মূলত নির্মাণশ্রমিকই বেশি।

'বাংলাদেশের নারীর অনুদ্‌ঘাটিত অবদান অনুসন্ধান: প্রতিবন্ধকতা, সম্পৃক্ততা ও সম্ভাব্যতা' নামের গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের নারীরা দৈনিক গড়ে ১৬ ঘন্টা গৃহস্থালির কাজ করেন, যার জন্য কোনো মজুরি তারা পান না। তাঁরা সব মিলিয়ে প্রতি বছর ৭৭ কোটি ১৬ ঘন্টা কাজ করেন। এতে এ কাজের মোট অর্থমূল্য হয় ছয় হাজার ৯৮১ কোটি থেকে নয় হাজার ১০৩ কোটি ডলার। এই অর্থ যদি বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) যুক্ত করা হতো, তা হলে এর আকার দ্বিগুণেরও বেশি হতো।

জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের যে অগ্রগতি তারও নেপথ্যের নায়ক বাংলাদেশের নারীসমাজ। আর সেই সত্যই আরও স্পষ্ট রূপে উঠে এলো বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) একটি জরিপে। রাজধানীর শেরেবাংলা

নগরের পরিসংখ্যান ভবনে এক সেমিনারে প্রকাশিত এক জরিপের ফলাফলে জানা যায়, বাংলাদেশে পুরুষের চেয়ে নারীরাই বেশি পরিশ্রমী। গৃহস্থালির কাজসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীরা বেশি সময় ধরে কাজে নিয়োজিত থাকেন। সার্বিকভাবে তা পুরুষের তুলনায় তিন গুণ বেশি। যদিও তাদের এ কাজকে আর্থিক মূল্যে বিবেচনায় নেয়া হয় না। অন্যদিকে পুরুষরা যখন বিনোদনে দুই ঘন্টা সময় ব্যয় করেন মেয়েরা করেন তার অর্ধেক (*দৈনিক যুগান্তর*, ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩)।

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর(বিবিএস) 'দেশের মানুষের সময়ের ব্যবহার' শীর্ষক নমুনা জরিপে এ তথ্য উঠে আসে। দেশের ৬৪ জেলার ৩৭৫ টি এলাকায় এ জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপের তথ্য উপস্থাপনকালে জরিপের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে একজন উপস্থাপক/বক্তা বলেন, বাংলাদেশের নারীরা তাদের অবসরেও কাঁথা সেলাইসহ অন্যান্য কাজ করে থাকেন। বলা প্রয়োজন, বাংলাদেশের নারীর দিনরাত্রি মুড়ানো থাকে কাজের আবরণে। যেন কাজই তাদের ষষ্ঠেন্দ্রিয়। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর গবেষণা প্রধান ফাহমিদা খাতুন এক গবেষণায় দেখিয়েছেন, বাংলাদেশে একজন পুরুষ যে কাজ করেন, তার ৯৮ শতাংশই জিডিপিতে যুক্ত করা হচ্ছে। আর একজন নারীর মাত্র ৪৭ শতাংশ কাজের স্বীকৃতি জিডিপিতে মিলছে।

বাংলাদেশে নারীর বাসাবাড়িতে রান্নাবান্না সন্তান লালন-পালনসহ গৃহস্থালির কাজকর্মের স্বীকৃতি জিডিপিতে নেই। এই শ্রমের আর্থিক মূল্যমানও নির্ধারণ করা হয় না।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৪ উপলক্ষে বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান **উন্নয়ন অন্বেষণ** প্রকাশিত গবেষণায় দেখা গেছে বাংলাদেশের নারীদের বার্ষিক মজুরিবিহীন গৃহকাজের অর্থনৈতিক মূল্য মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ১০ দশমিক ৭৫ শতাংশের সমতুল্য। এর আর্থিক মূল্য এক লাখ ১১ হাজার ৫৯১ দশমিক ৪৮ কোটি টাকা। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপির আকার ছিল ১০ লাখ ৩৭ হাজার ৯৯০ কোটি টাকা।

সুযোগ খরচ পদ্ধতি এবং বাজার প্রতিস্থাপন খরচ পদ্ধতি এই দুই পদ্ধতিতেই নারীদের মজুরিবিহীন গৃহস্থালি কাজের আর্থিক মূল্যমান হিসাব করা হয়েছে। সুযোগ খরচ পদ্ধতিতে শ্রমবাজারে অন্য বিকল্প থেকে যে আয় পাওয়া যায়, তার অন্য হিসাব করা হয়। আর বাজার প্রতিস্থাপন খরচ পদ্ধতিতে গৃহকর্ম করতে বিকল্প কাউকে নিয়োগ দেওয়া হলে কত টাকা ব্যয় হতো, তা হিসাব করা হয়। দেশের সাতটি বিভাগ থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে সাতটি জেলা নির্ধারণ করে ৫২০ জন নারীর ওপর এই জরিপ পরিচালনা করা হয়। দৈবচয়ন পদ্ধতিতে বেছে নেওয়া এ নারীদের মধ্যে শহরের ৩১৮ জন এবং গ্রামের ২০১ জন। গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির মতে, বাংলাদেশে সাধারণভাবে মজুরি এত কম না হলে এবং নারী ও পুরুষের মজুরিবৈষম্য না থাকলে ওই দুই পদ্ধতিতে মজুরিবিহীন গৃহস্থালি কর্মের মূল্যমান আরও বেশি হতো।

উন্নয়ন অন্বেষণ-এর গবেষণা অনুযায়ী, যেসব নারী চাকরি, ব্যবসা, হস্তশিল্প, দিনমজুরি এবং অন্যের বাসায় কাজে নিয়োজিত তারাও নিজেদের গৃহকর্মের জন্য দৈনিক যথাক্রমে গড়ে ৩.৭১, ৩.৬৯, ৫.২, ৪.৮ এবং ৪.৩ ঘন্টা সময় ব্যয় করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়, কাঠামোগত ব্যর্থতা ও প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অনেকাংশে দায়ী।

শ্রমবাজারে নারীদের আরও বেশি হারে অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করে প্রতিষ্ঠানটি বলছে, জীবনধারনের বাধ্যবাধকতা, ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাহিদা এবং পারিবারিক সহায়তা হ্রাস নারীদেরকে বিভিন্ন আয়বর্ধিষ্ণু কাজে নিয়োজিত হতে বাধ্য করছে।

২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'নারী, কর্ম ও অর্থনীতি' শীর্ষক এক গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছে আইএমএফ। তাতে যে বৈশ্বিক চিত্র ফুটে উঠে তা এরকম। শ্রমবাজারে নারীরা পূর্ণ কর্মদক্ষতা দেখাতে পারলে সামষ্টিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাতে করে বিশ্বের জিডিপি ২৭ শতাংশ বাড়ত। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে ৫ শতাংশ ও মিশরে ৩৪ শতাংশ বাড়ত।

আইএমএফ বলছে, সারা বিশ্বে ৮৬ কোটির বেশি নারী রয়েছেন, যাঁরা পুরো কর্মদক্ষতা দেখাতে পারছেন না। আশঙ্কার বিষয় হলো, দক্ষিণ এশিয়ার শ্রমবাজারের ৩৮ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ কমছে। ২০০৫ সালে শ্রমবাজারের ৩৮ শতাংশই ছিলেন নারী। আর ২০১০ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩২ শতাংশে। আর পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে এই হার সবচেয়ে বেশি, প্রায় ৬৩ শতাংশ নারী রয়েছেন, যাদের ওইসব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের, বিশেষ করে শ্রমবাজারের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

বিবিএস-এর জরিপের তথ্য মতে বাংলাদেশের নারীরা সময় ব্যবহারের দিক থেকে পুরুষদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ, যোগাযোগ সংস্কৃতির অগ্রগতি, জনসম্পৃক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীর দীপ্ত পদচারণা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দেশের সর্বময় প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, বিরোধীদলীয় নেত্রী, গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের বেশ ক'জন মন্ত্রী, দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, নারী বৈমানিক, নারী চিকিৎসক, নারী শিক্ষক, নারী কূটনীতিকসহ উচ্চপদে এবং

ব্যবসায় বাণিজ্য ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে নারীর পদচারণা বাড়লেও সার্বিকভাবে সাধারণ নারীসমাজের অবস্থার খুব একটা ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না। এখানেও আমরা বিত্ত বা শ্রেণীভেদে পরিবর্তন দেখতে পাই। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অবস্থানে থাকা নারীসমাজের সময়ের অধিক ব্যবহার বা বেশি পরিশ্রমও সামাজিক অবস্থানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারে না। সুতরাং নারী এগিয়ে যাচ্ছে এ ধরণের উচ্চারণে দেশের সামগ্রিক নারী সমাজের চিত্র, তাদের অবদান আড়ালেই থেকে যাচ্ছে, শীর্ষপদের কয়েক নারীর চিত্রই মুখ্য হয়ে উঠেছে। সাধারণ নারীর শ্রমঘন্টা, কাজের ধরন, তাদের অধিকার, প্রাপ্তি, অবদান, সমস্যা ও সম্ভাবনা এসব নিয়ে আরো গবেষণা হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রকৃত সমস্যা বেরিয়ে আসলে দেশের নারীর অগ্রগতির লক্ষ্যে সমাধানও খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ, উন্নয়ন ও রাজনীতিতে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে এগুতে হবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) ২০১৩ সালের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে ১৩৬টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৭৫।

২০১২ সালে এ অবস্থান ছিল ৮৬। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, অর্থনৈতিক সমতা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্যতার ভিত্তিতে ২০০৬ সাল থেকে এ তালিকা প্রকাশ করে আসছে ডব্লিউইএফ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রাজনীতিতে নারী-পুরুষ সমতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ১১ ধাপ এগিয়ে বাংলাদেশ। এ ক্ষেত্রে সার্কভুক্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। শ্রীলংকা ৫৫তম স্থান নিয়ে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের শীর্ষে রয়েছে।

সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পেছনে নারীর আপ্রাণ চেষ্টা এবং অংশগ্রহণ ভূমিকা রাখলেও নারী ক্ষেত্রবিশেষে বৈষম্যের শিকার। নারীদের এগিয়ে যেতে হবে সব ধরনের বাধা, সহিংসতা ও নির্যাতনকে অতিক্রম করে নিজ নিজ কাজের প্রতি, দায়িত্বের প্রতি যত্নশীল হয়ে এবং জ্ঞান বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে।

মহিলা পরিষদের তথ্যমতে, ২০১৩ সালে দেশে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৪ হাজার ৭৭৭টি। যৌন নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, আত্মহত্যা, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনসহ নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়েই চলেছে। শুধু মহিলা পরিষদের হিসাব কেন, সরকারি সংস্থা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) দেশে প্রথম বারের মতো নারীনির্যাতন নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে একটি জরিপ চালিয়েছে। 'ভায়োলেন্স এ্যাগেইনস্ট উইমেন (ভিএডব্লিউ) সার্ভে ২০১১' নামের এই জরিপেও নারী নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্রই ফুটে উঠেছে। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে এ প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। দেশের বিবাহিত নারীদের ৮৭ শতাংশই স্বামীর মাধ্যমে কোনো না কোনো সময়ে, কোনো না কোনো ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। পরিকল্পনা মন্ত্রাণালয়ের অধীন বিবিএস-এর এ জরিপ বলেছে, শারীরিক নির্যাতনের শিকার নারীদের মাত্র অর্ধেক চিকিৎসা নেওয়ার সুযোগ পান। এক-তৃতীয়াংশ নারীই স্বামী সম্মতি না দেওয়ায় চিকিৎসকের কাছে পর্যন্ত যেতেই পারেননি। সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের বিস্ময়কর সাফল্যের পেছনে নারীর অগ্রগতি বড় ভূমিকা রাখলেও, এভারেস্টের চূড়ায় বাংলাদেশের নারী পতাকা উড়ালেও, দুই দশকের বেশি সময় ধরে নারী দেশ শাসন করলেও ঘরের মধ্যে নারীর অবস্থান তেমন বদলায়নি। এ জরিপের তথ্য এমনটাই চিত্রিত করছে। এর মধ্যে ৬৫ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা স্বামীর মাধ্যমে শারীরিক নির্যাতন ভোগ করেছেন, ৩৬ শতাংশ যৌন নির্যতন, ৮২ শতাংশ মানসিক এবং ৫৩ শতাংশ নারী স্বামীর মাধ্যমে অর্থনৈতিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বহুদিন আগে থেকেই কাজ হচ্ছে। কিন্তু নারী নির্যাতনের বিষয়টা সামাজিক ব্যাধি বা জাতীয় সমস্যা হিসেবে এখনও চিহ্নিত করা যায়নি। এসব বিষয় সমাজ, সংসার, পরিবার, এমনকি দেশজুড়ে ঘটলেও ধরে নেয়া হয় এটা সামাজিক বিধান। দুর্বল সমাজ-কাঠামো, দুর্বল আইনের শাসন এ ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে। ১৯৭২ সালে সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্র বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করে তদানীন্তন সরকার নারী উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল। সংবিধানের ২৭ ধারায় উল্লেখ আছে- 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।' ২৮(১) ধারায় আছে- 'কেবল ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।' ২৮(২) ধারায় আছে-'রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।'

কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন। যেমন বহুল আলোচিত সিডও ধারা ২ এবং ১৬.১.গ সরকার এখনও অনুমোদন করেননি। ধারা দুটি ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা প্রচলিত আইনে বিভিন্ন বৈষম্যমূলক ধারা সংশোধন ও বৈবাহিক জীবনে নারী পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সত্যিকার অর্থে নারী পুরুষের সমঅধিকার সন্তানের অভিভাবকত্ব এবং পৈতৃক সম্পদে মেয়েদের সমঅধিকার ও অন্যান্য ধর্মের এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তার নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সিডওর পূর্ণাঙ্গ অনুমোদন, জাতীয় আইনের নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা

বাঞ্ছনীয়। কেননা সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আইনগত দিক থেকে বৈষম্য ও শোষণের শিকার হচ্ছেন নারীরা। ক্ষেত্রবিশেষে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হলেও এবং সভ্যতার অনেক উন্নতি সত্ত্বেও রাষ্ট্র ও পরিবারে নারীর প্রতি বৈষম্য বিরাজমান। নারীর মানবিক বিকাশ ও তার জীবনের নিরাপত্তা এখনও সংকটমুক্ত নয়। ঘরে সমাজে, কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে নারী দৈহিক, মানসিক ও অন্যান্য নির্যাতনের শিকার। স্বাধীনতার ৪২ বছর পরও আমাদের সমাজচিত্র কেন এমন হবে এটা ভীষণ চিন্তার বিষয়। প্রথমত ভাবতে হবে, স্বাধীনতার উষালগ্ন থেকে যে বিষয়টা আমরা লালন করে আসছি, সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছি সেটা কেন আমরা পালন করছি না? আমাদের গলদটা কোথায়?

জাতিসংঘের নারী বিষয়ক সংস্থা ইউএন উইমেন ২০১৪ সালের ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছেন– Equality for women is progress for all। এ প্রতিপাদ্যকে আমাদের ভাষায় বলছি অগ্রগতির মূল কথা, নারী-পুরুষ সমতা। স্বাধীনতার চার দশকেরও বেশি সময় পর জাতিসংঘের নারী বিষয়ক সংস্থা থেকে কেন এমন প্রতিপাদ্য বয়ে আনতে হচ্ছে? এমনটা তো আমাদের স্বাধীনতার মূলমন্ত্রেই ছিল। তা হলে আমরা কি পিছিয়ে গেলাম না? এই পিছিয়ে পড়া কি শুধু নারীসমাজের না সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজব্যবস্থার? সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে সুনির্দিষ্টভাবে তাকালে নারীর প্রতি সমতার বিষয়টা যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা স্পষ্ট। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট কাঠামোসহ রাষ্ট্র পরিচালনার সকল কর্মপরিকল্পনায় নারীর প্রতিনিধিত্ব নারী-পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য দূরীকরণ সহায়ক।

সরকারের ভাষ্যমতে, বাংলাদেশ সরকার নারীদের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছে। আর এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং রাষ্ট্র ও পারিবারিক জীবনে বৈষম্য দূরীকরণে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন, ২০১০ এবং পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) বিধিমালা ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই বিধিমালা নারীর সামগ্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, জেণ্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন, উন্নয়নের মূল স্রোতোধারায় নারীর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধকে জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মাতৃত্বকালীন ছুটি সবেতনে ৪ মাসের পরিবর্তে ৬ মাস বর্ধিত করা হয়েছে। সকল প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় শিশুদের জন্য বাবার পাশাপাশি মায়ের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। নাগরিকত্ব আইন ২০০৯-এর সংশোধনে সন্তানের উপর মায়ের অধিকারকে ক্ষমতায়িত করা হয়েছে। বৃদ্ধ বাবা-মায়ের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব নিশ্চিতকরণের জন্য পিতা-মাতার ভরণ পোষণ আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ৬০ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের সকল নাগরিকের সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকার প্রণীত এইসব বিধিবিধান শুধু খাতা-কলমে সীমাবদ্ধ না থেকে বাস্তবেও এর প্রতিফলন ঘটুক এবং মাঠ পর্যায়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হোক এটাই আমাদের দাবি। অন্যথায় 'অগ্রগতির মূলকথা, নারী-পুরুষ সমতা'– শুধু কাগুজে শ্লোগানই থেকে যাবে।

বিশ্ববাসী রব উঠেছে অর্থনীতির পরিসর বাড়াতে লিঙ্গসমতা জরুরি। অর্থাৎ নারীর কর্মঘণ্টা/সময়ের ব্যবহার আর অর্থনীতির মূল স্রোতের বাইরে রাখা যাবে না। বিশ্ববাজারের মোট কর্মসংস্থানের ৯০ শতাংশ বেসরকারি খাতে। তাই ব্যবসায়িক সম্প্রদায়সহ অন্যসব গোষ্ঠীর উচিত লিঙ্গসমতাকে প্রাধান্য দেওয়া। ৫ মার্চ ২০১৪ যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট প্রিন্সিপাল বা ডব্লিউইপির ষষ্ঠ বার্ষিক সম্মেলনে এ বক্তব্য উঠে আসে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মাঝে। তাঁরা বলেন, নারীদের কাজের সুবিধা বাড়ানো ও উন্নতি করতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট প্রিন্সিপাল বা ডব্লিউইপি আয়োজিত ঐ সম্মেলনে সারা বিশ্বের প্রায় আড়াইশ ব্যবসায়ী, সুশীল সমাজ, শিক্ষাবিদ ও সরকারের প্রতিনিধি যোগ দেন। তারা কেবল নারীদের সমস্যার কথাই তুলে ধরেননি। কাজের ক্ষেত্রে লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠায় নীতি, দৃষ্টান্ত ও পরামর্শ নিয়েও আলোচনা করেন। জাতিসংঘের নারী বিষয়ক সংস্থা ইউএন উইমেনের নির্বাহী পরিচালক পুমজাইল এমলামবো-এনগুকা- নারীদের ক্ষমতায়ন নীতিতে যেসব প্রতিষ্ঠান বা নেতা স্বাক্ষর করেছেন তাদের সাধুবাদ জানান।

তিনি বলেন, 'শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠা এবং সমাজ সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে তাদের পূর্ণ অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বে সহযোগিতা করা গেলে আমরা ন্যায়সঙ্গত ও সামুদয়িক অর্থনৈতিক উন্নতি এবং দারিদ্র্য কমাতে পারব। আর এটা হবে সব পক্ষের জন্যই মঙ্গলজনক। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার (আইএলও) তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখা এবং বৈশ্বিক মন্দার কারণে সৃষ্ট বেকারত্ব হ্রাস করতে হলে আগামী এক দশকে প্রত্যেক বছর গড়ে সাড়ে চার থেকে পাঁচ কোটি নতুন কর্মসংস্থানের প্রয়োজন হবে (সূত্রঃ www.unwomen.org)।

আমরা মাতৃতান্ত্রিক সমাজের বাসিন্দা নই, কিন্তু সার্বিক অর্থে শ্রমের জোয়ালটা সম্পূর্ণরূপেই মেয়েদের/মায়েদের কাঁধেই চেপে আছে। এর অর্থমূল্য হিসাব করা হয় না বলেই এই হিসেব তালিকা ভুক্ত করা হয় না বলেই নারীদের সামগ্রিক কাজকর্ম কর্মঘণ্টা হিসেবে পরিগণিত হয় না। পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সমাজের নারীদের অবদান বিকশিত হয় খুব কমই। এরকম মনোভাব থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। এদেশে ধর্মের নামে, বর্ণের নামে, সর্বপ্রথম আক্রান্ত হয় নারী। নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে কঠোর আইন থাকা সত্ত্বেও ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুকের দাবিতে নির্যাতনসহ নানা রকমের সহিংসতা দমনে আমাদের সমাজব্যবস্থা যেন দিন দিন দুর্বলই হয়ে পড়ছে। পথে ঘাটে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্র তো বটেই, এমন কি ঘরের ভেতরও নারীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তাহীনতা দূর হচ্ছে না। 'ভায়োলেন্স অ্যাগেইনস্ট উইমেন সার্ভে-২০১১' বিবিএস পরিচালিত জরিপও এর একটি বড় প্রমাণ। কিন্তু আমাদের সমাজব্যবস্থা এমন হবে কেন?

ভাবতে আনন্দ লাগে সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের বিস্ময়কর সাফল্যের পেছনে নারীর বিরাট অবদান রয়েছে। সামাজিক সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক বৈষম্য ও নিরাপত্তাহীনতা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক কার্যপ্রণালীতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। বাড়ছে শিক্ষার সকল পর্যায়ে নারীর সাফল্য, নারীরা পুরুষের সমান মেধার পরিচয় দিচ্ছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে নারীর অবস্থার উন্নতি হয়েছে। লিঙ্গ সমতা সূচকে এদেশের নারীদের অবস্থান এখন পার্শ্ববর্তী ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের নারীদের তুলনায় উন্নত হয়েছে।

কিন্তু অধিকারের সম্পূর্ণ সমতা আসেনি। চাকরির ক্ষেত্রে নারী সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত, নিম্ন আয়ের শ্রমজীবীদের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের চেয়ে কম মজুরি পান। স্থানীয় সরকার পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন তথা নারী নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো জরুরি। জাতীয় রাজনীতিতেও সমতার ভিত্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়েনি, নীতি নির্ধারণ ক্ষেত্রেও নারীর গুরুত্ব বাড়ছে না। এমনকি পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও না। নারীর সমঅধিকারের প্রশ্নটি কেবল নারী সমাজের অগ্রগতির সাথে সম্পৃক্ত নয়, সম্পৃক্ত গোটা সমাজ ব্যবস্থার সাথে গোটা সমাজের অগ্রগতির লক্ষ্যে নারীর প্রতি সকল বৈষম্য দূর করা এখন সময়ের দাবি। নারীর সময়ের ব্যবহার দেশের অর্থনীতির মূল শক্তি/ স্রোতের সাথে যুক্ত করা অত্যাবশ্যক। অন্যথায় অগ্রগতির দেশে কল্যাণ বয়ে আনবে না।

শাওয়াল খান
লেখক ও গবেষক

পাঠক-লেখক-শুভানুধ্যায়ী
সমীপেষু–

সাক্ষরতা বুলেটিন-এর প্রকাশনার প্রায় চৌদ্দ বছর পূর্ণ হতে চলেছে। এই দীর্ঘ সময়ে আমাদের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আপনাদের শুভেচ্ছা, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষণা। আর তা আমরা বিরতিহীনভাবে পেয়েছি বলেই বুঝতে পারি, এই ক্ষুদ্র পরিকল্পনার যে প্রাথমিক উদ্দেশ্য অর্থাৎ সাক্ষরতা, অব্যাহত শিক্ষা এবং জনসচেতনতা সৃজনে সহায়তা– তার কিছুটা হলেও পূরণ হয়েছে। আমরা আপনাদের সঙ্গে নিয়ে, আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে আরো এগিয়ে যেতে চাই।

তাই আগামী সংখ্যা থেকেই আমরা যুক্ত করতে চাই একটি নিয়মিত বিশেষ বিভাগ,– 'পাঠকের পাতা'। এই পাতায় আমরা প্রকাশ করতে চাই *বুলেটিন* সম্পর্কে আপনাদের বিভিন্নমাত্রিক অভিমত, প্রত্যাশা এবং শিক্ষা-সাক্ষরতার সেইসব দিক সম্পর্কে আপনাদের ভাবনা, যা হয়ত আমরা এখনো এই প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনি। আপনাদের সমালোচনাও আমাদের পাথেয় হয়ে উঠবে। যদি কলেবরের ওপর প্রবল চাপ না পড়ে তাহলে আপনাদের পূর্ণাঙ্গ অভিমত আমরা কেবল ভাষাগত সম্পাদনাসহ ছেপে দেবো।

অধিকন্তু, এই কয়েক বছরে আমাদের পত্রিকা পাঠ করে আপনারা যে ধারণা অর্জন করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে যদি স্থানীয় কোন শিক্ষা-সমস্যা ও সম্ভাবনাভিত্তিক লেখা পাঠান, তা প্রকাশ করতেও আমরা বিশেষভাবে আগ্রহী। লেখার সঙ্গে ছবি পাঠালে তাও আমরা মুদ্রিত করতে চাই। এ বিষয়ে আপনাদের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা কামনা করি।

সম্পাদক

জি য়া উ ল হা সা ন

বিশ্বের চিরদুর্জয় কবি নজরুল

শৈশবের প্রথম ভাগে যাঁর ছড়া, কবিতা পড়ে কিংবা সংশ্রুত হয়ে আমি নিবিড়ভাবে আলোড়িত হয়েছিলাম, তিনি আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। প্রাথমিক স্তরে পড়েছিলাম-

ভোর হলো দোর খোল, খুকুমনি ওঠ রে,
ঐ ডাকে জুঁই-শাখে ফুল-খুকি ছোট রে।

ঘুম থেকে শিশুকে জাগিয়ে তোলার এই কবিতা আমাদের কোমল হৃদয়ে যে ছন্দময় আনন্দের সৌরভ ছড়িয়েছিল তাতে আজও মন-প্রাণ বিভোর হয়ে আছে, কিঞ্চিৎ বিস্মৃত হইনি।

খুলি হাল তুলি পাল ঐ তরী চলল,
এইবার এইবার খুকু চোখ খুলল।

এর প্রতিটি শব্দের সঙ্গে শব্দের মিলনে যে চিত্রের ব্যঞ্জনা নির্মিত হয়েছে, তা শিশুর আবেগকে করেছে উদ্বেলিত। শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ করতে, হাঁটতে ফিরতে, চলতে চলতে কতবার যে আবৃত্তি করেছি নজরুলের এই 'প্রভাতী' কবিতাটি তা আজ আর গণনা করে বলা সম্ভব নয়।

এখন মনে হয়, কবিতাটিকে রূপক আখ্যায়িত করলে অত্যুক্তি করা হয় না। কবি যেন মানুষকে জাগতিক সুপ্তি অর্থাৎ সকল প্রকার অচেতনতা থেকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। নজরুলের অধিকাংশ কবিতায় বাক্যের পরতে পরতে স্পষ্ট আহবান রয়েছে দীর্ঘতম সময় জুড়ে সমাজে চলমান অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে অবহেলিত মানবজাতিকে সোচ্চার করে তোলার জন্য। তাঁর কবিতা, সাহিত্য আমাদের চেতনার একেবারে ভিত্তিমূলে আঘাত করে এবং আবহমান কাল ধরে সমাজে বিরাজমান বৈষম্য, ধর্মান্ধতা ও শোষণের বিরুদ্ধে মেরুদণ্ডটা একেবারে সোজা করে দাঁড়াতে আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছে।

আল্‌সে নয় সে ওঠে রোজ সকালে,
রোজ তাই চাঁদা ভাই টিপ দেয় কপালে।

সেই যে কবি আমাদের কপালে ভালোবাসার 'টিপ' পরিয়ে দিলেন, তা অদ্যাবধি হৃদয়ে লালন করছি। নজরুলের এরূপ এবং আরও অনেক কবিতা, ছড়া পড়তে পড়তে আমার বয়স হল ষোল। কৈশোর উত্তীর্ণ হয়ে তারুণ্য তখন আমার শরীর, হৃদয়, আর চেতনায় ছড়িয়ে পড়েছে, আমি তখন উদ্দীপ্ত, উপচিত।

আমাদের দেশ, দেশের মানুষ যখন বিজাতীয় ধর্মান্ধদের দ্বারা নির্মমভাবে আক্রান্ত, ঠিক সেই সময়, ১৯৭১ সালে, বঙ্গবন্ধু ডাক দিলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের। এ দেশের হাজার হাজার তরুণ ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ দেশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার দৃঢ় অভিপ্রায়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। স্বাধীন বাংলা বেতার-কেন্দ্র থেকে প্রচারিত তাঁদের বীরত্বের সংবাদ, বার বার পঠিত ও গীত রবীন্দ্র-নজরুলের কবিতা, গান আমার তারুণ্যে যেন আগুন ছড়িয়ে দিল। উজ্জীবিত হলাম আমি কবির ছন্দে, আভাসে- 'বাজিছে দামামা বাঁধ রে আমামা'। একদা মনে হল,

ঘরে বসে শুধু স্বপ্ন দেখলে 'স্বাধীনতা' হামাগুড়ি দিয়ে আঙিনায় প্রবেশ করবে না। তাই স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজকে উৎসর্গ করতে চাইলাম মাতৃভূমির জন্য।

এগার জনে গঠিত মুক্তিফৌজের ছোট্ট একটি দলের সঙ্গে সংযুক্ত হলাম সেপ্টেম্বর মাসের ২৩ তারিখে। তখন আমি মাত্র দশম শ্রেণির ছাত্র। বিস্ময়করভাবে আমার চেতনা জুড়ে তখন কেবল নজরুল। তা কি কেবল তাঁর কবিতার অন্যতম মূলসুর 'বিদ্রোহে' আমি উদ্বুদ্ধ বলে ! যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকে ছিলাম বাংলাদেশের অকুতোভয় সৈনিক, গেরিলা যোদ্ধা। নজরুলের কবিতা ও গান থেকে আমাদের আগুন সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই ছিল, কিন্তু তার চেয়েও অধিক আমাকে আকৃষ্ট করেছিল সামাজিক অত্যাচার, অসাম্য, আর ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে রচিত তাঁর অসাধারণ কাব্য, কথামালা। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁবুতে বসে অবসর হলে পড়তাম *সঞ্চিতা*। মুক্তিযুদ্ধে আমার ধমনীর স্রোতোধারায়, বৈপ্লবিক ভাবনায়, অতন্দ্র প্রহরীর মতো জেগে রইলেন নজরুল।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার বহু পূর্বে নজরুলের কবিতা, গান ও প্রবন্ধসমূহ রচিত হলেও তা আমাদের দেশের দরিদ্র, ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য সবসময় প্রাসঙ্গিক ছিল। তিনি এ দেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে চিরস্থায়ী দ্বন্দ্ব, হানাহানি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধকল্পে অবিরাম লিখে গেছেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল, সকল ধর্মের মানুষকে মুক্তির জন্য মানবিক ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করা। তাই এই অবিস্মরণীয় কবিকে বলা হয়েছে 'মানুষের কবি'। বাংলাদেশের বর্তমান সংকট মুহূর্তে, ধর্মে ধর্মে অবিশ্বাস যখন পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলেছে, সেই মুহূর্তে নজরুলের মানবিক দর্শন, মানুষ্যত্ব প্রকাশের আহবান আমাদের জীবনে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ১৯২৬ সালে রচিত তাঁর 'মন্দির-মসজিদ' থেকে এখানে স্মরণ করা যেতে পারে –

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার বহু পূর্বে নজরুলের কবিতা, গান ও প্রবন্ধসমূহ রচিত হলেও তা আমাদের দেশের দরিদ্র, ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য সবসময় প্রাসঙ্গিক ছিল। তিনি এ দেশে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে চিরস্থায়ী দ্বন্দ্ব, হানাহানি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধকল্পে অবিরাম লিখে গেছেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল, সকল ধর্মের মানুষকে মুক্তির জন্য মানবিক ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করা। তাই এই অবিস্মরণীয় কবিকে বলা হয়েছে 'মানুষের কবি'। বাংলাদেশের বর্তমান সংকট মুহূর্তে, ধর্মে ধর্মে অবিশ্বাস যখন পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলেছে, সেই মুহূর্তে নজরুলের মানবিক দর্শন, মানুষ্যত্ব প্রকাশের আহবান আমাদের জীবনে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

মানুষ তাহার পবিত্র পায়ে-দলা মাটি দিয়া
তৈরী করিল ইট, রচনা করিল মন্দির-মসজিদ।
সেই মন্দির-মসজিদের দুটো ইট খসিয়া
পড়িল বলিয়া তাহার জন্য দুইশত মানুষের
মাথা খসিয়া পড়িবে? যে এ কথা বলে,
আগে তাহারই বিচার হউক।

নজরুল ইসলাম আমাদের জীবনে কী বিশাল ক্ষেত্র জুড়ে ছায়াবিস্তার করে আছেন, তার প্রমাণ দিয়ে সহজেই সমাপ্তি টানা যাবে না। যাঁরা আজ ধর্মনিরপেক্ষতার ঝাণ্ডা উঁচিয়ে এগিয়ে চলেছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নজরুলের জীবন, রচনা, দর্শন তাঁদের কোনো না কোনো ভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি নিজেও তা অনুভব করি। ধর্ম নিয়ে পূর্বাপর চিন্তাভাবনা করেন, এমন একজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ লিখেছেন, 'ধর্ম কোনো সময়েই মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার রূপে আসেনি। ধর্ম এসেছে একটা নির্দিষ্ট সময়ে যখন একদল মানুষ শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সামাজিক সুবিধাভোগী শ্রেণিতে পরিণত হয়। অন্য দিকে ব্যাপক মানুষ বঞ্চিত হতে শুরু করেন। বঞ্চিতের সাথে প্রবঞ্চকের দ্বন্দ্বকে প্রশমিত করার জন্যই ধর্ম আর রাষ্ট্র দুটোরই উৎপত্তি। মানুষের যুগান্ধতার সুযোগে এইগুলো মানুষকে শর্তাধীন করে তুলতে সক্ষম হয়। 'বিদ্রোহ' দমনই এর মূলনীতি। তাই ধর্মের ইতিহাস হল রক্ত আর হিংসার ইতিহাস।'

এইরূপ কাটখোট্টা কথাবার্তা বলে অনেকেই চায়ের কাপে ঝড় তুলতে পারেন, কিন্তু তা সহজেই সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, তা বলার মতো অনুকূল পরিবেশ এখনও এ দেশে সৃষ্টির অপেক্ষায় রয়েছে। প্রকারান্তরে আমরা যদি নজরুলের উপর্যুক্ত প্রবন্ধের অন্য একটি অংশ থেকে উদ্ধৃত করি; লক্ষণীয় হল, তা অধিকতর স্পষ্ট, সর্বজনীন এবং 'ধর্মীয় গোঁড়ামি

থেকে মুক্তির পথ নির্দেশক' বলে মনে হয়। নজরুলের ভাষায়–

অবতার-পয়গাম্বর কেউ বলেননি, আমি
হিন্দুর জন্য এসেছি, আমি মুসলমানের
জন্য এসেছি, আমি ক্রিশ্চানের জন্য এসেছি।
তাঁরা বলেছেন, আমরা মানুষের জন্য এসেছি–
আলোর মতো, সকলের জন্য।
আলো নিয়ে কখনো ঝগড়া করে না মানুষে,
কিন্তু গরু-ছাগল নিয়ে করে।"
['হিন্দু-মুসলমান', *রুদ্র মঙ্গল*, ১৯২৬]

নজরুল ইসলামকে কারও সঙ্গে তুলনা করা সংগত নয়, তিনি আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন বাঙালির হৃদয়মণিতে। আমরা একাত্তরের স্বাধীনতাকামী মানুষগুলো যে কেবল মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁকে পেয়েছিলাম যুদ্ধের প্রেরণা, তথা হাতিয়ার স্বরূপ, তা নয়, তিনি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত, এমনকি আমি বিশ্বাস করি, অনাগত প্রজন্মের বিজ্ঞানমনস্কদের চেতনায় বারবার যৌক্তিক কারণেই ফিরে আসবেন। এর প্রধান কারণ – নজরুলের ধর্মীয় উদারতা, সামাজিক সাম্যের প্রতি দুর্বলতা ও মানবপ্রেম।

অবিভক্ত ভারতের মুসলিম কবি আল্লামা ইকবালের লেখা 'আরমগানে হেজাজ' - এর একটি কবিতায় আছে- "দ্বী বন্দায়ে মোমেন কি লিয়ে মওত হে এয়া খাব। অর্থাৎ মোমেনের জন্য ধর্ম মৃত্যু বা নিদ্রার মতো। পাকিস্তানের বিশিষ্ট ইকবাল গবেষক জনাব ইউসুফ সেলিম চিশ্‌তি এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন–

'যে ধর্ম ধার্মিকদের মধ্যে স্বাধীনতা ও মাথা উচুঁ করে দাঁড়ানোর প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে না, তা ধর্ম নয়; তা আফিমের বড়ি বা মৃত্যুর বার্তা মাত্র।'

আমরা এর কোনোটাই অস্বীকার করতে পারি না। তবে এর মূল যে বিষয়টি আমাদের প্রাণিত করেছে, তা হল, সমাজে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে সচেষ্ট থাকা। নজরুল এই সাধনায় যে জয়ী হতে পেরেছিলেন, তা তাঁর জীবন ও জীবনদর্শনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে সহজেই বোঝা যায়। তিনি কখন ওই জীবনের সঙ্গে, সমাজ প্রতিপালিত বৈষম্য ও অসাম্যের সঙ্গে এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির সঙ্গে আপোষ করেননি, বরং এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।

বলতে দ্বিধা নেই, নজরুল লেখার মধ্য দিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সামাজিক বিষয়গুলোকে তুলে ধরেছেন, তার মধ্যে প্রধান উল্লেখযোগ্য হল, মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসা স্থায়ী করবার প্রধান অন্তরায়, অর্থাৎ ধর্মে ধর্মে হিংসা, রক্তপাত, হানাহানি ইত্যাদি পরিহারে মানুষকে অনুপ্রাণিত করা। তাঁর মধ্যে আবেগ ও যুক্তি সমভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। তিনি শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এক হাতে অস্ত্র অন্য হাতে কলম ধরেছিলেন। উভয়ই সমাজকে ক্রমাগত আঘাত করে, বলা যায়, শৈশব থেকেই আমাদের সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাইতো মনে পড়ে, একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য যখন ভারতের পথে রওয়ানা হয়েছিলাম, তখন সঙ্গে নেওয়া কাপড়-চোপড়ের ছোট্ট পোঁটলার মধ্যে নজরুলের *সঞ্চিতা* কাব্যগ্রন্থটি লুকিয়ে নিতে ভুলিনি।

দেশে দেশে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে, গণজাগরণে, সংগ্রাম ও আন্দোলনে, প্রেম ও ভালোবাসায় এবং সর্বোপরি আমাদের মানবিক ধর্ম-বিশ্বাসে কাজী নজরুল ইসলামের প্রভাব চিরস্থায়ী হয়ে আছে। তাঁর সেই অস্তিত্ব গভীরভাবে অনুভব করি।

আজ দেশের সর্বত্র যখন বিষাক্ত ধর্মান্ধতা এবং হীন সাম্প্রদায়িকতার হিংস্র আস্ফালনে গগন প্রকম্পিত, তখন মনে হয় নজরুলের কাছে নতজানু হয়ে উচ্চারণ করি –

হে রুদ্র, বিদ্রোহী কবি, হে চিরদুর্জয়, মানুষের কবি, তুমি আমাদের সুমতির পথ প্রদর্শন কর, নিয়ে চল তোমারই অনুসৃত পথে। শোনাও মুক্তির জয়গান। কান পেতে যেন শুনি বারবার তোমার সেই অমোঘ প্রত্যাশার বাণী –

সেই রুদ্র আসিতেছেন, যিনি ধর্ম-মাতালদের আড্ডা
ঐ মন্দির-মসজিদ-গীর্জা ভাঙিয়া
সকল মানুষকে এক আকাশের গম্বুজ-তলে
লইয়া আসিবেন।

ইতিহাসের পাতায় কাজী নজরুল ইসলামের মতো কবির আগমন অনেক সময়ের ব্যবধানে হয়তো ঘটে, কিন্তু সকলের বৈশিষ্ট্য ও দৃষ্টিভঙ্গি অভিন্ন নয়। নজরুলের কবিতা, গান, গদ্য একদিকে যেমন ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণার উৎস, তেমনি স্বাধীনতা- উত্তরকালে জীবনকে ক্রমাগত অর্থবহ করার জন্য তা হয়ে উঠেছে আমাদের আশ্রয়। আমরা অনবরত তাঁর শরণাপন্ন হয়ে বাঁচতে শিখি। বৃহত্তর ঐক্যের বন্ধনে একসাথে বসবাস করার মূলমন্ত্র, সে তো নজরুল-কাব্যেই আমরা খুঁজে পাই।

প্রফেসর জিয়াউল হাসান
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
সরকারি তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ

[লেখাটি সরকারি তোলারামপুর কলেজ-এর বার্ষিকী ২০১৩ *শীকর*-এ প্রকাশিত।]

গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ (৪-১০ মে) ২০১৪

শিক্ষা ও প্রতিবন্ধিতা সমঅধিকার, সমসুযোগ

যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পেলে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী বিপুল সম্ভাবনাময় মানব সম্পদে পরিণত হতে পারে তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ শিউলী সাথী। ২০১১ সালে এথেন্স, ২০০৭ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত স্পেশাল অলিম্পিক গেমসসহ আরও অনেক আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অংশগ্রহণ করে পুরস্কার ছিনিয়ে আনা বাংলাদেশের মেয়ে প্রতিবন্ধী শিউলী সাথী বাংলাদেশের জন্য এক অমূল্য মানব সম্পদ।

একীভূত শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির দায়িত্ব সরকারের। "সবার জন্য শিক্ষা"র লক্ষ্য অর্জন করতে হলে পিছিয়ে পড়া সকল গোষ্ঠীর কথা চিন্তা করে সার্বিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এ বাস্তবতার আলোকে এ বছর শিক্ষা ও প্রতিবন্ধিতা: (Education and Disability) প্রতিপাদ্য এবং সমঅধিকার, সমসুযোগ (Equal Right, Equal Opportunity) শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ৪ থেকে ১০ মে বিশ্বব্যাপী পালিত হলো 'গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ ২০১৪'। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে একটি উন্নয়নশীল দেশের জনসংখ্যার শতকরা দশভাগ হতে পারে প্রতিবন্ধী। সেই অনুসারে বাংলাদেশে কম-বেশি দেড় কোটি লোক প্রতিবন্ধী। কিন্তু **বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা** ও **বিশ্ব ব্যাংক**-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা বর্তমানে ১০০ কোটি। এর মধ্যে ২ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ (মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৫%) বাস করে বাংলাদেশে। বস্তুত এই জনগোষ্ঠী তাদের মৌলিক অধিকার ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা থেকে প্রায়শই বঞ্চিত ও বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। শিক্ষা সকলের মৌলিক অধিকার হলেও প্রতিবন্ধিতার কারণে স্কুল গমনোপযোগী প্রতিবন্ধী শিশুদের একটি বড় অংশ শিক্ষার বাইরে থেকে যাচ্ছে। আবার যারা অনেক প্রচেষ্টার পর শিক্ষায় যুক্ত হচ্ছে, অনুকূল পরিবেশের কারণে কিছুদিন পরে তারাও আবার ঝরে পড়ছে।

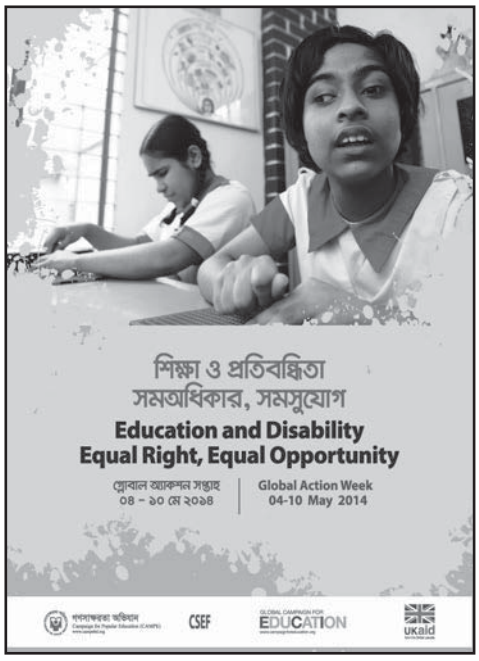

বাংলাদেশে নানা পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। এগুলো হলো প্রাতিষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক, বিশেষ শিক্ষা, সমন্বিত ও একীভূত শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদি। বিশেষ ও সমন্বিত শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী আরও দশটি শিক্ষার্থীর মত লেখাপড়া করার সুযোগ পায় সে জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকা একান্ত আবশ্যক।

প্রতিবন্ধী এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সর্বক্ষেত্রে সমঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করার যাবতীয় দায়িত্ব রাষ্ট্রের। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে এই বৈষম্যপূর্ণ অবস্থার কারণে চাকুরীসহ অন্যান্য ধরনের সামাজিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, নারী প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে বৈষম্যের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুন। **বিশ্ব ব্যাংক**-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের দরিদ্রতম ব্যক্তিদের প্রতি ৫ জনের ১ জন কোন না কোন ধরনের প্রতিবন্ধিতার শিকার। সমাজের একটি বিরাট অংশকে বঞ্চিত রেখে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন কখনই সম্ভবপর নয়। একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি শুধু শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকেই বঞ্চিত হচ্ছে তা নয় একইসাথে তাকে সেবাপ্রদানকারী অপর ব্যক্তিও এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংক-এর আরেকটি প্রতিবেদনে উল্লেখ্য করা হয়েছে যে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও তার সেবাপ্রদানকারী ব্যক্তির শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগের সৃষ্টি না করার জন্য বাংলাদেশে তার জাতীয় আয়ের প্রায় ১.৭ ভাগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

প্রতি বছরের মত এবছরও বাংলাদেশে জিসিই-র সমন্বয়ক হিসেবে গণসাক্ষরতা অভিযান শিক্ষা ও প্রতিবন্ধিতা প্রতিপাদ্য নিয়ে গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ ২০১৪ উদযাপন করলো। বহুসংখ্যক সহযোগী সংস্থা বিশেষ করে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কর্মরত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, সুশীল সমাজ প্রতিনিধি, পেশাজীবী সংস্থা, শিক্ষক সমিতি এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর অভিযানের সাথে সম্মিলিতভাবে এই সপ্তাহ উদযাপন করেছে।

গণসাক্ষরতা অভিযান এই সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে বেশ কয়েকটি পরিকল্পনা সভার আয়োজন করে। সভাগুলিতে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা, বিশেষ করে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কর্মরত বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষক সমিতি ও সিভিল সোসাইটির বিভিন্ন গ্রুপের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় পর্যায়ের আলোচনা সভা

গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ উপলক্ষে গণসাক্ষরতা অভিযান জাতীয় পর্যায়ে বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত World Development Report 2013 on Jobs' প্রতিবেদনের আলোকে গত ৫ মে ২০১৪, প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁ-এ JOBS in BANGLADESH, A Policy Dialogue with Stakeholders on WDR 2013 শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করে। জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত এ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. মুজিবুল হক চুন্নু, এম.পি, ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এম. এ. মান্নান, এম.পি ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তরের পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, কর্পোরেট সেক্টরের প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী সংগঠনের প্রতিনিধি, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও সুশীল সমাজের শতাধিক প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভায় প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে দক্ষ মানব সম্পদ পরিণত করার লক্ষ্যে কারিগরী শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসূচিসমূহ

সারা দেশে গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ ২০১৪-এর কর্মসূচি বাস্তবায়নের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য গণসাক্ষরতা অভিযান সারা দেশে ৫৯টি জেলায় মোট ৫৯টি সংস্থাকে নির্বাচিত করেছিল। নির্বাচিত সংস্থা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে শতাধিক অন্যান্য পার্টনার এনজিও গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ-২০১৪ উপলক্ষে নানাবিধ কর্মসূচি পালন করে।

গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহের মূল কর্মসূচি

সংবাদ সম্মেলন: গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ ২০১৪-এর কর্মসূচি কেন্দ্রে ছিল সংবাদ সম্মেলন এবং শিশু সমাবেশ। যা যথাক্রমে ৪ মে ও ৭ মে ২০১৪ তারিখে অভিযান তার সহযোগী সংস্থার সাথে একযোগে সারা দেশে আয়োজন করে। প্রেস ব্রিফিং-এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের

প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার চিত্র সংবাদিকসহ সুশীল সমাজের সামনে তুলে ধরা হয়। স্থানীয় পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যের উপর আয়োজন করা হয় এই প্রেস ব্রিফিং। একই সাথে এ বিষয়ে করণীয় নিয়ে সকলের সাথে আলোচনা করা হয় যাতে করে গণমাধ্যম প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার সঠিক চিত্র এর মাধ্যমে তুলে ধরতে পারে।

সুধী সমাজের অভিমত

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সক্ষমতা ও অবদান সম্পর্কে কার্যকর প্রচারাভিযান চালু করা এবং এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচারের জন্য গণমাধ্যমের সকল শাখাকে উৎসাহিত করা;
- শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় সুবিধাবঞ্চিত সকল শিশুর সাথে প্রতিবন্ধী শিশুদেরও অগ্রাধিকার দেয়ার লক্ষ্যে তাদের ভর্তির বয়সসীমা শিথিল করা;
- 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' অনুযায়ী প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য পরিকল্পিত শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর প্রত্যেক পিটিআইতে কমপক্ষে একজন দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ প্রদান;
- প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুযায়ী ব্রেইলসহ যথাযথ শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত ও বিতরণসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- প্রতিবন্ধিতার ধরণ ও লিঙ্গ অনুযায়ী সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা এবং বিদ্যমান শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা;
- প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মূলধারার শিক্ষা সম্পৃক্ত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির দক্ষতা যাচাইয়ে জরিপ পরিচালনা;
- 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষা আইন-২০১৩' যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- সারাদেশে সরকারি অফিসে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও অধিকার সংক্রান্ত তথ্য সংবলিত সিটিজেন চার্টার প্রদর্শন;
- যে সকল বিদ্যালয় ভবনে এখনো র‍্যাম্প-এর ব্যবস্থা করা হয়নি অবিলম্বে সে সমস্ত বিদ্যালয়ে র‍্যাম্প স্থাপনসহ টয়লেট,

টিউবওয়েল এবং বিনোদনের ক্ষেত্রে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা;

- প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ উপবৃত্তি কিংবা শিক্ষাভাতা নিশ্চিত করা;

শিশু সমাবেশ ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজন করা হয় শিশু সমাবেশের। সেখানে শিক্ষা নিয়ে কর্মরত ব্যক্তি, প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে কর্মরত প্রতিষ্ঠান, এনজিও কর্মী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক, এসএমসি সদস্য, শিক্ষা কর্মকর্তা, স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা, নারীনেত্রী, নারী সংগঠনের প্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ, জনপ্রতিনিধি, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি ও সিভিল সোসাইটির গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ অংশ নেন এবং প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর শিক্ষা ও মূলধারায় অংশগ্রহণের বিষয়ে তাদের সুচিন্তিত মতামত ও সুপারিশ প্রদান করেন।

- প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার বিষয়টি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অধীনে নিয়ে আসা;
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য বিশেষ মন্ত্রণালয় গঠন বা সমাজ সেবার অধিদপ্তরের অধীনে বিশেষ বিভাগ গঠন।
- প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুযায়ী চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনা করে তাদের সক্ষমতা নির্ধারণপূর্বক পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করা;
- প্রয়োজনীয়তার নিরিখে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- যতদূর সম্ভব প্রতিবন্ধী শিশুর কর্মরত মাতা-পিতাকে সন্তানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সন্নিহিত এলাকায় নিয়োগ-বদলির ব্যবস্থা করা;
- ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য কার্যকরভাবে কোটা সংরক্ষণ করা;
- জাতীয় বাজেটে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার জন্য আলাদা বাজেট বরাদ্দ এবং এই বরাদ্দের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার বিশেষ উপকরণ উন্নয়ন, শিক্ষকের প্রশিক্ষণ ও স্কুলের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় করা।

অন্যান্য কর্মসূচি

সহযোগী সংস্থাসমূহ স্থানীয় অবস্থা বিবেচনা করে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে, যেমন,

- প্রতিপাদ্যকেন্দ্রিক মানববন্ধন, উদ্বুদ্ধকরণ ও উদ্ভাবনী কর্মসূচি;
- প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য নানা ক্যাম্পেইন;
- স্থানীয় প্রশাসন ও স্থানীয় সরকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ;
- পত্র-পত্রিকায় এলাকাভিত্তিক প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষাচিত্র তুলে ধরা;
- বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন;
- গণজমায়েত, শিক্ষা- বিষয়ক ক্যাম্পেইন;
- পোস্টার প্রদর্শনী, বিতর্ক, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা;

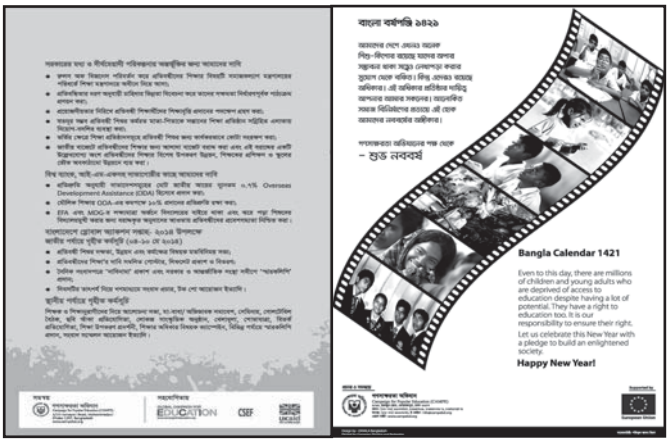

- প্রতিপাদ্যের আলোকে গম্ভীরা, জারীগান, কবিতা আবৃত্তি, পথনাটক, দেয়ালিকা প্রদর্শনী, মা সমাবেশ ইত্যাদি।

উপকরণ উন্নয়ন ও বিতরণ

অভিযানের উদ্যোগে গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ ২০১৪ উদযাপনের অংশ হিসেবে এবারের প্রতিপাদ্য শিক্ষা ও প্রতিবন্ধিতা -এর আলোকে পোস্টার, প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও দাবিসংবলিত লিফলেট প্রকাশ করা হয়।

এছাড়া অন্যান্য বছরের মতো সবার জন্য শিক্ষা বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষার অধিকার আলোকে বিভিন্ন স্লোগান এবং ছবিসম্বলিত বাংলা বর্ষপঞ্জি-১৪২১ প্রকাশ করা হয়। প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষার অধিকারের পক্ষে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণীত এসব উপকরণসমূহ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সারা দেশে বিতরণ করা হয়। এছাড়া ৮টি বাংলা এবং ৩টি ইরেজি পত্রিকায় এই সপ্তাহ উপলক্ষে উন্মুক্ত আহ্বান প্রকাশ করা হয়।

উপসংহার

১৯৯০ সালের মার্চ মাসে থাইল্যান্ডের জমতিয়েন-এ 'সবার জন্য শিক্ষা' বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলন ও ২০০০ সালে ডাকারে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলন এবং মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট লক্ষ্যসহ ২০০৭ সালে প্রতিবন্ধকতায় আক্রান্তদের অধিকার সুরক্ষায় গৃহীত জাতিসংঘের সনদ "Convention on the Right of Persons with Disabilities"-এ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ স্বাক্ষর করেন। অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশ সরকারও উপর্যুক্ত লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে আন্তজার্তিক সনদে স্বাক্ষরকারী ১টি দেশ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(খ) ধারায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার বিশেষ করে কর্মসংস্থানের অধিকার স্বীকৃত। প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে না পারলে ইএফএর ৬টি লক্ষ্য এবং এমডিজি-এর ৮টি লক্ষ্যসহ আন্তর্জাতিক অনেক অঙ্গীকারই আমরা পূরণ করতে ব্যর্থ হবো।

প্রতিবেদন: **রেহানা বেগম**
উপ কার্যক্রম কর্মকর্তা
পলিসি অ্যাডভোকেসি এন্ড মাস কমিউনিকেশন ইউনিট

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শুমারি

দেশে বেকারের সংখ্যা প্রায় ২৬ লাখ। এদের জন্য পর্যাপ্ত কারিগরি ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এর মূল কারণ হলো, সরকারের কাছে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য নেই। এ কারণে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শুমারি করবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুর্যো (বিবিএস)। গতকাল রোববার বিবিএস আয়োজিত এক কর্মশালায় এসব তথ্য জানানো হয়।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ের পরিসংখ্যান ভবনে 'কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান শুমারি' শীর্ষক এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব নজিবুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জীবন কুমার চৌধুরী। বিবিএস মহাপরিচালক গোলাম মোস্তফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন বিবিএসের উপপরিচালক বাইতুল আমীন ভূঁইয়া।

কর্মশালায় বলা হয়, দেশে প্রায় ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে কর্মক্ষম জনশক্তি হচ্ছে ৫ কোটি ৬৭ লাখ। কিন্তু কর্মসংস্থান হয়েছে ৫ কোটি ৪১ লাখ লোকের। এ হিসাব মোট বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ। এজন্য এ বেকার জনশক্তিকে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু সরকারের কাছে এ সংক্রান্ত সঠিক কোনো তথ্য নেই। ফলে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাচ্ছে না।

এজন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান শুমারি করবে বিবিএস। আগামী মাসে শুমারির গণনা কাজ শুরু হবে।

কর্মশালায় জানানো হয়, এ মহূর্তে বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৬ হাজার ৮৬৪; যার আসনসংখ্যা ৫ লাখ ৮৮ হাজার ৪৯৬। এছাড়া এনজিও পর্যায়ে অনেক কারিগরি প্রতিষ্ঠান আছে, যার তথ্য অনেকেই জানেন না। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে মোট কতটি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে, কতগুলো ট্রেডে কত সংখ্যায় প্রশিক্ষণ প্রদান করছে, এ তথ্যগুলো পেলেই কেবল নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হবে। এ কারণেই গুরুত্বপূর্ণ এ শুমারির উদ্যোগ নিয়েছে সবকার।

বিবিএস সচিব নজিবুর রহমান বলেন, এ জরিপের মাধ্যমে সরকারসহ নীতিনির্ধারকদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে। বিবিএস মাঠপর্যায় থেকে সঠিক তথ্য সংগ্রহে বদ্ধপরিকর।

বর্ণিক বার্তা ০৫.০৫.২০১৪

টিকে থাকতে শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়াতে হবে

নীতি সংলাপে আলোচকেরা বিশ্ববাজারে টিকে থাকার জন্য শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁরা আরও বলেছেন, সামগ্রিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা, ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ, সুশাসন এবং শ্রমিক অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন আইন ও নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে।

গতকাল সোমবার গণসাক্ষরতা অভিযান এবং বিশ্বব্যাংকের যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত নীতি সংলাপে এসব কথা বলা হয়।

বিশ্বব্যাংকের 'দ্য ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০১৩: জবস' প্রতিবেদনের বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য দাতা সংস্থা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধিসহ অংশীদারদের সঙ্গে এ সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধূরী।

প্রতিবেদনটি বলছে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ে। মানুষ আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে বেশি অংশগ্রহণের সুযোগ পেলে কর্মজীবী নারীর ক্ষমতায়ন হয়। এ ধরনের নারীর সন্তানদের জীবনমান উন্নত হয়। দারিদ্র্যতাও কমে। সংলাপের প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক। বিশেষ অতিথি ছিলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী এম এ মান্নান। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন সাংসদ শিরীন আখতার, বিআইডিএসের গবেষণা পরিচালক বিনায়ক সেন, পোশাকমালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর সভাপতি আতিকুল ইসলাম, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনাম।

প্রথম আলো ৬.০৫.২০১৪

স্বতন্ত্র প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার চালুর দাবি

প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য 'স্বতন্ত্র প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার' বাস্তবায়নের দাবি জানিয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের সংগঠন বাংলাদেশ প্রাইমারি এডুকেশন সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশনের নেতারা। একই সঙ্গে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়মিত পদোন্নতির সুযোগ রেখে বাস্তবসম্মত নিয়োগবিধি প্রণয়নের দাবিসহ মোট আট দফা দাবি জানান তারা। গতকাল শনিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর (এলজিইডি) ভবনের হলরুমে 'প্রাথমিক শিক্ষায় সাফল্য অর্জনে অংশীজনের ভূমিকা' শীর্ষক এক সভায় এ দাবি জানানো হয়।

এ সময় সংগঠনের পক্ষ থেকে আট দফা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি উপস্থাপন করেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আজহারুল ইসলাম। তাদের অন্য দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে- প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী বোর্ড গঠন, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির(নেপ) স্বায়ত্তশাসন বাতিল, বিভাগীয় পর্যায়ে পরিচালক পদ সৃষ্টি, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের সব পদে পদোন্নতি, বেতন স্কেলের বৈষম্য দূর, প্রাথমিক শিক্ষাখাতে বিভিন্ন প্রকল্পসহ সর্বস্তরে প্রেষণ বাতিল করে নিজস্ব জনবল নিয়োগ করা। সংগঠনটির দাবির সঙ্গে একমত পোষণ করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার।

সংগঠনের আহ্বায়ক নবী হোসেন তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং সাবেক প্রতিমন্ত্রী মো.মোতাহার হোসেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব কাজী আখতার হোসেন, প্রাথমিক ও শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক শ্যমল কান্তি ঘোষ প্রমুখ।

সমকাল ১১.০৫.২০১৪

প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণী পরিবর্তন আসছে ১১ পাঠ্যপুস্তকে

আগামী অর্থবছরে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যাপক কর্মপরিকল্পনা হাতে নিচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রাথমিক স্কুলের জন্য ১১ কোটি ২ লাখ বই ছাপানো হবে। একই সঙ্গে প্রথম শ্রেণী থেকে তৃতীয় শ্রেণীর ১১টি পাঠ্যপুস্তক রিভিউ করা হবে। এ রিভিউয়ের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে আভাস পাওয়া গেছে। কর্মপরিকল্পনা অনুসারে শিশুদের উপযোগী খেলাধুলার সামগ্রী, প্রাক-প্রাথমিক কারিকুলাম সরবরাহ করা হবে। যেসব বিদ্যালয়ে শ্রেণীকক্ষ পাঠদানে উপযোগী নয়, সে কক্ষগুলোকে শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষার্থী অনুপাতে কমিয়ে আনা হবে। যেসব ঝুঁকিপূর্ণ বিদ্যালয় ভবন রয়েছে, সেসব বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ করা হবে। পর্যায়ক্রমে দেশের প্রতিটি বিদ্যালয়ে ডিজিটাল সম্পর্কিত পাঠদান করা হবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, আগামী অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্পে বরাদ্দ রাখা হচ্ছে ২ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। এ উপবৃত্তি অর্থ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিতরণ করা হবে। বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় এরই মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হলেও আগামী অর্থবছরেই এ কার্যক্রম শেষ করা হবে। ২০১০ সাল থেকে এ প্রকল্পের আওতায় ১ হাজার ৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কারে প্রকল্প আগামী অর্থবছরে শেষ করা হবে। ২০০৬ সাল থেকে এ প্রকল্প শুরু হয়। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল জরাজীর্ণ

সরকারি বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ। এর পাশাপাশি বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র, টয়লেট ও টিউবওয়েল স্থাপন। আগামী অর্থবছরেও রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প অব্যাহত থাকছে। এর আওতায় প্রায় ১০ হাজার লিখন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। আগামী অর্থবছরে ১০টি উপজেলায় সব প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ী মাদরাসার শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট বিতরণ করা হবে। এরই মধ্যে যেসব বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী খোলা হয়েছে, সেখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যেও বিস্কুট বিতরণ করা হবে।

জানা গেছে, আগামী অর্থবছরে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসায় অধ্যায়নরত ২৭ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যেও উচ্চমান পুষ্টিসমৃদ্ধ বিস্কুট বিতরণ করা হবে। আগামী অর্থবছরে ইংলিশ ইন অ্যাকশন প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। একই সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা বাড়ানোর জন্য অডিও ভিজ্যুয়াল উপকরণ ব্যবহারের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

এদিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা জানান, কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে কিছুটা সমস্যা হবে। এর মূল কারণ চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ না পাওয়া। কারণ বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে ১ হাজার ৫০০ বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পটি আগামী অর্থবছরে শেষ হওয়ার কথা। সময়মতো অর্থ না পাওয়া গেলে প্রকল্প শেষ করা কঠিন হবে।

আলোকিত বাংলাদেশ ২১.০৫.২০১৪

প্রতিবন্ধীদের সমান অধিকার দিতে হবে ।। তথ্যমন্ত্রী

প্রতিবন্ধীদের কারও দয়া বা করুনা নয় সকল নাগরিকের ন্যায় সমান অধিকার ভোগ করতে দিতে হবে। পরিবারের যেকোন বধির বা প্রতিবন্ধী সন্তান সাধারণ সুস্থ সন্তানের চেয়ে বেশি সুবিধা পাওয়ার অধিকার রাখে। পরিবারে তাদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য নয় সর্বোচ্চ সুবিধা দিন। এখন থেকে কোন শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত বধির নাগরিক ঘরে বসে থাকবে না। সরকার তাদের জন্য সরকারের কোটা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় চাকরির ব্যবস্থা করবে। তারা আমাদেরই সন্তান। এদেশে জন্মগ্রহণ করেছে বিধায় সব অধিকার ভোগের ক্ষমতা তারা রাখে। সমাজে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকার সর্বোচ্চ আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। সোমবার রাজধানীতে জাতীয় বধির সংস্থার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বধিরদের নিয়ে উৎসব র‍্যালির উদ্বোধন শেষে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এসব কথা বলেন।

সারাদেশ ও বিদেশ থেকে আগত কয়েক হাজার বধিরদের নিয়ে জাতীয় বধির ভবনের সামনে আয়োজিত র‍্যালিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, সরকার চায় প্রতিটি নাগরিকের ন্যায় বধির অথবা সব শ্রেণীর প্রতিবন্ধীদের প্রাপ্য সব সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে। সরকার পূর্বের করা প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন বাতিল করে প্রতিবন্ধীদের পরিপূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী অধিকার সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করেছে। সরকারের প্রতিষ্ঠিত ঢাকা বধির হাইস্কুলটিকে ডিগ্রী কলেজে রূপান্তররের ঘোষণা দেন। বধির ও প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে পর্যায়ক্রমে দেশের সব জেলায় শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধীদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে। যাতে কারিগরি ও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের সব টেলিভিশন ও মিডিয়ায় ইশারা ভাষায় সংবাদ পাঠের ব্যবস্থা করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিচ্ছে তথ্য মন্ত্রণালয়। বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের কর্মক্ষম করে গড়ে তুলতে ঢাকার লালবাগ সরকারের প্রদত্ত ১ একর জমি উদ্ধার করা হবে। দখলকৃত বধিরদের জমি উদ্ধারে প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা নিতে আজই আমি (সোমবার) প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরব। দখলদারদের হাত থেকে অতি দ্রুত জমি উদ্ধারে সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেবে সরকার। জমিটি দখলের পর বধিরদের উন্নতিকল্পে ওই স্থানে একটি পূর্ণাঙ্গ বধির কমপ্লেক্স তৈরি করা হবে। যাতে বধিরদের জন্য বিশেষ স্কুল, কলেজ, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ছাত্র ও ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ করবে সরকার। দেশের প্রতিটি নাগরিকের উচিত প্রতিবন্ধী বিশেষ করে শ্রবণ ও বাক প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে এগিয়ে আসা।

দুইদিনব্যাপী দেশী বিদেশী বধিরদের নিয়ে আয়োজিত সম্মেলনে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জাতীয় সম্মেলনে নিয়ে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান বলেন, প্রতিবন্ধীরা করুণা নয় স্বচ্ছ মেধার মাধ্যমে চাকরির নিশ্চয়তা চায়।

জনকণ্ঠ ২১.০৫.২০১৪

গণিতে সৃজনশীল প্রশ্ন ৬০ শতাংশ

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষায় এ বছর থেকে গণিতে ৬০ শতাংশ সৃজনশীল প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেয়া হবে। এছাড়া বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর বরাদ্দ রাখা হয়েছে। জেএসসিতে গত বছর বাংলা ২য় পত্র, ইংরেজি ১ম ও ২য় পত্র এবং গণিত ছাড়া অন্য বিষয়ের পরীক্ষা সুজনশীল প্রশ্নপত্রে হয়েছে।

২০১৪ সালের জেএসসিতে গণিতের নম্বর পুর্নন্টন করে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি আদেশ জারি করেছে। এর আগে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সমন্বয় সভায় এ বছরের জেএসসি পরীক্ষার জন্য গণিতের নম্বর পুনর্বন্টন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিষয়ের নম্বর বন্টন করা হয়।

আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে, গণিতের সুজনশীলে পাটিগণিত অংশ থেকে দুটি, বীজগণিত থেকে তিনটি, জ্যামিতি থেকে তিনটি এবং পরিসংখ্যান অংশ থেকে একটি করে মোট ৯টি প্রশ্ন থাকবে। আর বহুনির্বাচনী অংশে পাটিগণিত থেকে ১০ থেকে ১২টি, বীজগণিত থেকে ১০ থেকে ১৫টি, জ্যামিতি থেকে ১০ থেকে ১৫ টি এবং পরিসংখ্যান অংশ থেকে দুই থেকে তিনটি করে ৪০টি প্রশ্ন থাকবে। অন্যদিকে, জেএসসির তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে জন্য ২৫ নম্বর এবং বহুনির্বাচনী প্রশ্নের জন্য বাকি ২৫ নম্বর করেছে এনসিটিবি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে আটটির মধ্যে পাঁচটিচ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আর বহুনির্বাচনীতে থাকবে ২৫টি প্রশ্ন।

আজকের কাগজ ২৪.০৫.২০১৪

শিক্ষার মান উন্নয়নে বেশি ভূমিকা রাখতে হবে প্রাথমিক শিক্ষকদের

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদের পদমর্যদা বৃদ্ধি, বেতন বৈষম্য দূর করা, প্রধান শিক্ষক পদে সরাসরি নিয়োগ বন্ধসহ বিভিন্ন দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকা মহানগর নাট্যমঞ্চের কাজী বশির মিলনায়তনে শিক্ষক সমাবেশ ও আলোচনা সভায় মন্ত্রী এ আশ্বাস দেন। বাংলাদেশ প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক সমিতি এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সভায় মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরই সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখতে হবে। কারণ, প্রাথমিক পর্যায়েই একজন শিক্ষার্থীর মেধার বিকাশ ঘটে। আর শিক্ষার মান বাড়লে শিক্ষকদেরও সব দাবি পর্যায়ক্রমে মেনে নেবে সরকার। সভায় সাংসদ শিরীন আখতার বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মানসম্পন্ন পাঠদানের মাধ্যমে একটি আদর্শ জাতি গঠন করা সম্ভব। এ জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের দক্ষতা বাড়াতে হবে। সেই সঙ্গে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের মধ্যে পদোন্নতির ব্যবধান কমিয়ে আনতে হবে। বাংলাদেশ প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক সমিতির আহ্বায়ক নাসরিন সুলতানার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সাংসদ ফজলে হোসেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য কুমার দাস, বাংলাদেশ প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক সমিতির সদস্য সচিব মোহাম্মদ শামছুদ্দীন প্রমুখ বক্তব্য দেন।

প্রথম আলো ১৪.০৫.২০১৪

শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শন কার্যক্রম

৪ থেকে ৬ মে ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযানের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শন বিষয়ক এক পরিদর্শন কার্যক্রম। এই পরিদর্শন কার্যক্রমের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির সদস্যদের ২০১৩ সালে বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। পরিদর্শন কার্যক্রমে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক), মেহেরপুর এবং আশ্রয় ফাউন্ডেশন, খুলনা পরিচালিত ৪টি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কমিটির মোট ৩০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এ পরিদর্শন কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শনের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন। অংশগ্রহণকারীগণ পরিদর্শন কার্যক্রম শেষে তাঁদের অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। পরিদর্শন কার্যক্রম ছাড়াও ৪টি ওয়াচ গ্রুপ কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের উপর অভিজ্ঞতা বিনিময়ের লক্ষ্যে একটি অভিজ্ঞতা বিনিময় সভাও এসময় অনুষ্ঠিত হয়।

মির্জা মো. দেলোয়ার হোসেন

JOBS in BANGLADESH: A Policy Dialogue with Stakeholders on WDR 2013

গণসাক্ষরতা অভিযান প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে 'সবার জন্য শিক্ষা'-র লক্ষ্য অর্জন এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর বিস্তরণ ও বাস্তবায়নে নানামুখী কর্ম উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত World Development Report 2013 on `Jobs' প্রতিবেদনের আলোকে জাতীয় পর্যায়ে ৫ মে ২০১৪, প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও-এ JOBS in BANGLADESH, A Policy Dialogue with Stakeholders on WDR 2013' শীর্ষক একটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করে। জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত এ মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. মুজিবুল হক চুন্নু, এম.পি, ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এম. এ. মান্নান, এম.পি, ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিরীন আক্তার, সদস্য, শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় কমিটি, আকরামুল হক, সভাপতি, বাংলাদেশ ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইন্ডাস্ট্রিজস, আতিকুল হক, বাংলাদেশ গার্মেন্টর্স ম্যানুফ্যাকচারিং এক্সপোর্টারস এসোসিয়েশন (বিজেএমইএ)।

অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আরস্থ খান, অতিরিক্ত সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বজলুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (কারিগরি), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, চৌধুরী শোফাদ আহমেদ, প্রকল্প পরিচালক স্কিলস ডেভেলপমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট, গোলাম মো. জহিরুল আলম, প্রকল্প পরিচালক, স্টেপ প্রজেক্ট, সেলিমা আহমদ, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, রুবিনা হুসেন ফারক, ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ফেডারেশন অব উইমেন এন্টারপ্রেনিউরস, প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি), ড. তাসনীম সিদ্দিকী, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, রিফিউজি এণ্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু) ও অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢা.বি. লরি সেমেলাক, কো-চেয়ার এসএলসিজি ও ২য় সেক্রেটারি, কানাডিয়ান হাই কমিশন, শাহীন আনাম, নির্বাহী পরিচালক, মানুষের জন্য ফাউণ্ডেশন (এমজেএফ), ফরিদা ইয়াসমিন, নির্বাহী পরিচালক, ধারা, ড. এম মুহিবুর রহমান, সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাশেদা চৌধূরী, নির্বাহী পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান।

এছাড়াও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তরের পদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, কর্পোরেট সেক্টরের প্রতিনিধি, উন্নয়ন সহযোগী সংগঠনের প্রতিনিধি, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিসহ সুশীল সমাজের শতাধিক প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

এনামুল হক খান তাপস

আঞ্চলিক মতবিনিময় সভা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১

একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হলো দক্ষ শ্রমশক্তি। বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ, দেশের অধিকাংশ লোক বেকার ও অদক্ষ। এই জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার লক্ষ্যে সরকার জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছে। গণসাক্ষরতা অভিযান দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের ধারণা উন্নয়ন, কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং কার্যক্রম বিস্তরণে সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে এনএসডিসি ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সঙ্গে বিভিন্ন সভা ও সেমিনার আয়োজন করে আসছে।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৪ মে ২০১৪ তারিখ গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সাভার ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ উদ্যোগে পিএইচএ ভবনে অনুষ্ঠিত হয় 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১' শীর্ষক আঞ্চলিক মতবিনিময় সভা। মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আ.ন.ম সালাউদ্দিন খাঁন, পরিচালক, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর। বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাকী হাসান, নির্বাহী পরিচালক, ইউসেপ, অখিলা ডি রোজারিও, পরিচালক, মটস, কারিতাস ও কোহিনুর ইয়াসমিন, নির্বাহী পরিচালক, তরঙ্গ। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক মাহামুদ শাহ কোরেশী, ডীন, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, গণবিশ্ববিদ্যালয়। উপর্যুক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগের প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি, প্রাইভেট দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, মিডিয়া ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ ১০৫ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্বাহী পরিচালক মো. গোলাম মোস্তফা দুলাল এবং সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন তপন কুমার দাশ, উপ-পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান। 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১'-এর ওপর একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জীবন কুমার চৌধুরী প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এনএসডিসি সচিবালয়।

মিজানুর রহমান আখন্দ

ইউসেপ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এস.এস.সি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা ২০১৪-এ প্রথম তিনটি স্থান লাভ

ইউসেপ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় প্রথম তিনটি স্থান

দখল করেছে। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য কাজ করা বেসরকারী সংগঠন ইউসেপ পরিচালিত খুলনা, ঢাকা, ও চট্টগ্রাম তিনটি কারিগরি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই স্থান অর্জন করে।

এবার কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল এক হাজার ৯৮৭। কারিগরি বোর্ডে পাশের হার ৮১.৯৭ শতাংশ। কিন্তু ইউসেপের তিনটি বিদ্যালয়ে পাশের হার ৯৯.৫৯ শতাংশ। ইউসেপ রাজশাহী কারিগরি বিদ্যালয় পঞ্চম স্থান দখল করেছে।

এই সাফল্য আরো বেশী উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে বিদ্যালয়ে পাঠরত শিশুরা আর্থিকভাবে অসচ্ছল ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবার থেকে আসা। এ বছর ২৪৫ জন ছাত্রছাত্রী ইউসেপের বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। ইউসেপ মিরপুর টেকনিক্যাল স্কুল ২য় স্থান অর্জন করে। এই স্কুলের ৬৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে তাদের অভাবনীয় সাফল্যের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ইউসেপ কর্তৃপক্ষ ২৭ মে ২০১৪ তারিখে একটি সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

ফারদানা আলম সোমা

পরিবেশ দিবস ২০১৪ উদ্‌যাপন বিষয়ক পরিকল্পনা সভা

গণসাক্ষরতা অভিযান পরিবেশ শিক্ষা ও সচেতনতা উন্নয়নে সহাযোগী সংস্থার সঙ্গে নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০ মে ২০১৪ তারিখ গণসাক্ষরতা অভিযানে বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০১৪ উদ্‌যাপন বিষয়ক একটি পরিকল্পনা সভার আয়োজন করা হয়। এ বছর গণসাক্ষরতা অভিযান বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে সারাদেশে ৭টি নির্বাচিত

সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ৭টি জেলায়- বাগেরহাট, ময়মনসিংহ, বরগুনা, সাতক্ষীরা, নোয়াখালী, কুড়িগ্রাম এবং মৌলভীবাজার-এ পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন করবে। স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ও পরিবেশ শিক্ষা ও সচেতনতা উন্নয়নে এবং বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপনের জন্য এই পরিকল্পনা সভার আয়োজন করা হয়।

এবারে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য হলো, **হতে হবে সোচ্চার, সাগরের উচ্চতা বাড়াবোনা আর** (Raise your voice Not the Sea level)। এ সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাকিবা খাতুন, উর্ধ্বতন উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক এবং সভাপতিত্ব করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ।

শামীম আরা কলি

এডুকেশন ওয়াচ ২০১৩ প্রতিবেদনের প্রকাশনা উৎসব

২৫ মে ২০১৪ গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে ঢাকার আগারগাস্থ এলজিইডি-আরডিসি ভবনের (লেভেল-১২) মিলনায়তনে এডুকেশন ওয়াচ ২০১৩ প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল এডুকেশন ওয়াচের ১২শ প্রকাশনা। এবার প্রতিবেদনের বিষয় ছিল State of Pre-Primary Education in Bangladesh: New Vision Old Challenges."নব রূপকল্প পুরনো চ্যালেঞ্জ: বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা' শিরোনামে এই গবেষণার প্রকাশনা উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব কাজী আখতার হোসেন ভুইয়া, সম্মানিত অতিথি ছিলেন ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, স্যার ফজলে হাসান আবেদ কেসিএমজি। অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ ও ডেলিগেশন অফ ইরোপিয়ান ইউনিয়নের ফাস্ট সেক্রেটারী Libuse Soukupova. প্রকাশনা উৎসবে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা অহছানিয়া মিশন সভাপতি ও গণসাক্ষরতা অভিযানের চেয়ারপাসন কাজী রফিকুল আলম। অনুষ্ঠান সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক ও এডুকেশন ওয়াচের সদস্য সচিব রাশেদা কে. চৌধূরী। অনুষ্ঠানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এনজিও, নারী ও শিশু অধিকার বিষয়ক সংস্থা, শিক্ষক সংগঠন, সিভিল সোসাইটির অন্যান্য গ্রুপ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও দাতা সংস্থা-র প্রতিনিধি সহ প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর/প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিও ছিল অত্যন্ত উৎসাহব্যাঞ্জক।

গবষেণা প্রতিবেদনটি সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করেন এ ষ্টাডির প্রধান গবেষক সমীর রঞ্জন নাথ। গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে, পাঁচ বছর বয়সী ১৫ লক্ষ শিশু এখনো প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে রয়ে গেছে। দেখো গেছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের জন্য এখনো সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রস্তুত নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভৌতসুবিধা, শিক্ষা সামগ্রী, শিশুবান্ধব শ্রেণী কক্ষ, আনন্দদায়ক শিশু শিখন পরিবেশ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, গবেষণা প্রতিবেদনে সরকারি বিদ্যালয়ের সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে অপ্রতুল বরাদ্দের বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হবে।

স্যার ফজলে হাসান আবেদ কেসিএমজি বলেন, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বাইরে যে শিশুরা রয়ে গেছে তাদের বিদ্যালয়ে আনতে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কাছে প্রাক -প্রাথমিক শিক্ষা ছেড়ে দেয়ার কথা বলেন।

প্রকাশনা উৎসবে বিশেষ অতিথি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সম্পদ কম। কিন্তু দেশের সামগ্রিক শিক্ষার চালচিত্রের পরিবর্তন এসেছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ বলেন, এ গবেষণা প্রতিবেদনে অনেক তথ্যের গরমিল রয়েছে। তবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দেয়ার জন্য অভিভাবক ও শিক্ষকদের উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম বলেন, মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার দেয়ার জন্য শিক্ষকদের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

গণসাক্ষরতা অভিযান-এর নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধূরী বলেন, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ওপর বেইসলাইন তৈরি করা প্রয়োজন যা ভবিষ্যতে এ শিক্ষা ব্যবস্থা অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে সহায়ক হবে।

জয়া সরকার

গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ
৪ - ১০ মে ২০১৪

শিক্ষা ও প্রতিবন্ধিতা : সমঅধিকার, সমসুযোগ
Education and Disability: Equal Right, Equal Opportunity

বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সর্বত্র প্রতিবন্ধী মানুষেরা শিক্ষাসহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থেকে প্রায়শঃ বঞ্চিত হচ্ছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশ্ব ব্যাংক এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ১০০ কোটিরও অধিক প্রতিবন্ধী মানুষ রয়েছেন যা মোট জনসংখ্যার ১৫%। শিক্ষাসহ সর্বক্ষেত্রে এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সমঅংশগ্রহণ ও সমসুযোগ নিশ্চিত করার দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের হলেও তাদের অধিকার এখনো নিশ্চিত হয়নি। এই প্রেক্ষিতে সবার জন্য শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সমঅধিকার ও সমসুযোগ নিশ্চিত করার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে এ বছর ৪ মে থেকে ১০ মে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও পালিত হচ্ছে গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ (GAW)। কিন্তু **শুধু এই সপ্তাহেই নয়, আমরা চাই সর্বদা সর্বত্র সব মানুষের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা হোক**।

গ্লোবাল অ্যাকশন সপ্তাহ ২০১৪ উপলক্ষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে সরকারের কাছে আমাদের দাবি

- ‘প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩’ যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিধি প্রণয়নসহ প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে
- ‘রুলস অফ বিজনেস’-এ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শিক্ষার বিষয়টি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়ে আসতে হবে
- ‘জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০’-এর নির্দেশনা অনুযায়ী একীভূত শিক্ষা (Inclusive Education) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিদ্যালয়গুলোতে সবধরণের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুসারে মানসম্মত শিক্ষা-র সুযোগ-সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করতে হবে
- জাতীয় বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শিক্ষার জন্য আলাদা এবং যথাযথ বরাদ্দ রাখতে হবে এবং এই বরাদ্দের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের শিক্ষার উপযুক্ত উপকরণ উন্নয়ন, শিক্ষকের প্রশিক্ষণ ও বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় করতে হবে
- শিক্ষক প্রশিক্ষণ সিলেবাসে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ের অন্তর্ভুক্তিসহ প্রতিটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে এবং বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধিতা উপযোগী শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে
- প্রতিবন্ধিতার ধরণ অনুযায়ী চাহিদার ভিন্নতা বিবেচনা করে তাদের সক্ষমতা নির্ধারণপূর্বক পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং উপযুক্ত শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত ও বিনামূল্যে বিতরণসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে
- ‘জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১’ এর নির্দেশনা অনুযায়ী সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করতে হবে
- প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে
- সরকারী বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহে প্রতিবন্ধী শিশুদের ভর্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে
- সকল বিদ্যালয়ে র‍্যাম্পসহ প্রতিবন্ধীবান্ধব টয়লেট ও টিউবওয়েল স্থাপন করতে হবে
- সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমে (extra curricular activities) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে
- প্রতিবন্ধিতা প্রতিরোধে ‘শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি ২০১৩’ (ECCE Policy)-র আলোকে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সক্ষমতা ও অবদান এবং তাদের প্রতি বিরাজমান বৈষম্য সম্পর্কে নিয়মিত প্রচারাভিযানের জন্য গণমাধ্যমের সকল শাখাকে স্বপ্রণোদিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে
- সারাদেশে সরকারি অফিসগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শিক্ষা ও অধিকার সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত ‘সিটিজেনস চার্টার’ স্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গণসাক্ষরতা অভিযান তথ্য বিতরণ, সঞ্চালন ও কার্যক্রমের আওতায় জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বার্তা, তথ্য, শ্লোগান ইত্যাদি *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এ নিয়মিত ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসমূহের উন্নয়নমূলক ও মানবাধিকার সম্পর্কিত এ ধরনের বার্তা, তথ্য ও শ্লোগান বুলেটিন কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

সাক্ষরতা বুলেটিন

সংখ্যা ২৪০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২১ মে ২০১৪

মে দিবস সংখ্যা

সম্পাদক

বিভিন্ন দিবস পালনের একটা রীতি বর্তমান সমাজে বেশ পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছে। সব দেশের, সব অঞ্চলের মানুষের কাছে তাদের প্রিয়, গৌরবময় বা ঐতিহ্যবাহী কিছু কিছু দিন থাকে। আর সেসব দিন উপলক্ষে থাকে নানা আয়োজন। বর্ষ আরম্ভ অথবা ক্রিসমাস, ঈদ বা শারদীয় পূজা পালনের উৎসবমুখর রীতির সঙ্গে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অভিমুখী যাত্রার একটা অনাদি যোগ আছে।

উৎসটা হয়ত ওখানেই ছিল, কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতি বা কাল পরিক্রমার সঙ্গে মানবজমিনের সমস্যার বহুতর প্রকৃতি ও পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত, বিগত চার দশকে সামাজিক সমস্যার বিশ্বব্যাপী সংকটের অনুধাবন এমনভাবে বেড়েছে যে, বোধ হয় বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে জাতিসংঘ চিহ্নিত আর কোন বিশেষ দিবসের সংস্থান নির্ধারণ করা দুরূহ হয়ে দাঁড়াবে।

কিন্তু জাতিসংঘের তক্‌মা-মারা বিভিন্ন দিবসের বাইরে কয়েকটি দিন আছে, যার উৎপত্তি ঘটেছিল ওই আন্তর্জাতিক সংস্থাটির জন্মগ্রহণের আগে। পহেলা মে বা মে দিবস পালনের আহ্বান বা রীতি তার সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ। শিকাগোর একটি বিশেষ স্থানে শ্রমিকদের কাজের শ্রমঘণ্টা নির্দিষ্ট করার আন্দোলন থেকে যার জন্ম। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বর্তমানে দিনটি শ্রমিক দিবস হিসেবেও পালিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকদের সমস্যা নানামুখী, তা শুধু শ্রমঘন্টার মধ্যে আবদ্ধ নয়। তাই মে দিবস উপলক্ষে নানা আয়োজনের শ্রমিকদের আরও মৌলিক কিছু দাবি-দাওয়ার কথা উচ্চারিত হয়।

শ্রমিকের অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়েই বিশ শতকের গোড়ার দিকে রাশিয়ায় সাম্যবাদী রাষ্ট্র সংগঠনের আন্দোলনের সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। ওই রাজনৈতিক আন্দোলনের সাফল্য পৃথিবীর মানচিত্রটাকে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। অনেকে ভেবেছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন পতনের পর শ্রমিক অধিকার বা 'মে দিবস' নিয়ে উত্তেজনা হয়ত স্তিমিত হয়ে যাবে। তা হয়নি, হবার কথাও নয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, জাতিসংঘের নানা মানবতাবাদী তৎপরতা ও সমাজবিজ্ঞানীদের অবিরত তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পরও শ্রমিকদের জীবনের কাম্য স্বস্তি এখনো বহু দূর।

বাংলাদেশের বিপুল মানুষ কৃষিকাজে নিয়োজিত। শহর বা উপশহরে, কোন মাঠে বা বাজারে মানুষ ভিড় করে থাকে সস্তা মজুরি বিক্রি করার জন্য। রাস্তা বানানোর খোয়া ভাঙে যে নারী অথবা কাজ করে গৃহভ্যন্তরে, তাদের কপালে শ্রমিকের মর্যাদাও জোটে না। সাম্প্রতিক কালে পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের দাবির প্রতি কিছু বাধ্যতামূলক স্বীকৃতি জুটলেও, রানা প্লাজা অথবা তাজরিন ফ্যাশনের মত ধ্বংসযজ্ঞ বুঝিয়ে দেয় কত অরক্ষিত শ্রমিক জীবনের পরিণতি। হাজার হাজার যেসব শিশুর কথা ছিল দিনের বিশেষ সময়ে শ্রেণীকক্ষে থাকার, তারা নানা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে, ন্যায্য মজুরি বা নির্দিষ্ট শ্রমঘণ্টার কোন বালাই নেই তাদের জন্য। তাই মে দিবসের আহ্বান বোধ হয় চিরজীবী হয়েই থাকবে।

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

সম্পাদক
রাশেদা কে. চৌধূরী

গণসাক্ষরতা অভিযান ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক প্রকাশিত। মেসার্স তিথি প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং, ২৮/সি-১ টয়েনবী সার্কুলার রোড, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা

সম্পাদকীয় যোগাযোগ● ফোন: ৮১১৫৭৬৯, ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২ ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২মেইল: info@campebd.org Website: www.campebd.org